শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব

১
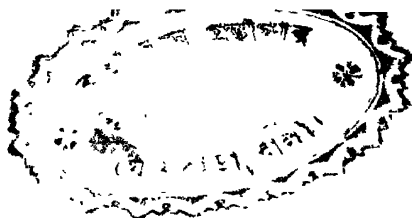
একদিন যার বন্ধুত্বের ছিন্নসূত্র খুটিয়া এই ছন্নছাড়া জীবনের ইতিহাস লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম, তখন কে জানিত আর একদিন তারই ইতিহাস দিয়া এ দীর্ঘ জীবনের ভ্রমণ কাহিনী শেষ করিতে হইবে। সে দিন ভাবিয়াছিলাম সে বুঝি চির দিনের জন্য আমার প্রণয়ের গুটি ভেদ করিয়া প্রজাপতির মত উড়িয়া গেল। কি আশ্চর্য্য, এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার দেখা মিলিব তখন কে জানিত!

এ কাহিনী প্রথমবার যখন লিখি তখন বলিয়াছিলাম পা দুটা থাকিলেই ভ্রমণ করা চলে, কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই তো লেখা চলে না। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি একবার লিখিয়া অভ্যাস হইয়া গেলে হাত দুটাকে আর থামাইয়া রাখা অসম্ভব। অনেক অভিজ্ঞতার পরে দেখিলাম চলিয়া চলিয়া পা দুটা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু লিখিয়া হাত দুটা ক্লান্ত হয় না।

বৃদ্ধ বয়সে যখন ভাবিয়াছিলাম হাত দুটার আর ব্যবহার করিব না, এমন সময়েই এমন অসম্ভব রূপে সে-ই আমাকে লিখিতে বাধ্য করিল। আজ সেই কথাই বলিব।

হ্যারিসন রোড দিয়া চলিতেছিলাম পথের পাশে এক জায়গায় ভিড় জমিয়াছে; ভাবিলাম বোধ হয় কাবুলিওয়ালা সস্তায় কম্বল বেচিতেছে। লোটা-কম্বলের উপর আমার ছোট বেলা হইতেই লোভ, কাজেই আগাইয়া গিয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিছুই দেখা যায় না। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত পা বদ্‌লাইতে লাগিলাম: শেষে আর না পারিয়া বসিয়া পড়িয়া বিড়ি টানিতে সুরু করিলাম। সেই বিড়ির আলোয় অতিদূর অতীতের একখানি কোমল মুখ মনে পড়িল। সেদিন সেই মুখ ছিল কচি ডাবের মত নিটোল ও নরম; আজ তাহা হইয়াছে ঝুনো নারিকেলের মত শুষ্ক ও শীর্ণ। কিন্তু সেই একই মুখ।

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে, রাত্রি অনেক হইলে দেখিলাম ভিড় সরিয়া গিয়াছে, সন্ন্যাসী একা। কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, ভাল করিয়া দেখিয়া আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না; সেই আজানুলম্বিত হাত, বয়স হওয়াতে একটু বেশী লোমশ ও শীর্ণ হইয়াছে মাত্র।

আমি আবেগ ভরে ডাকিলাম—ইন্দ্রনাথ! সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—আরে শ্রীকান্ত যে!

আমি কম্পিত স্বরে বলিলাম,—তোমাকে এস্থানে এভাবে এতদিন পরে দেখব ভাবি নাই ইন্দ্রনাথ!

সে ওষ্ঠে আঙুল দিয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—ও নাম ধরে ডেকো না শ্রীকান্ত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন? সে মৃদু স্বরে বলিল—দাগী শ্রীকান্ত। আমিও মৃদুতর স্বরে বলিলাম, তুমিও আমাকে ও নামে ডেকো না—

—কেন? দাগী নাকি?

আমি বলিলাম—না, সাহিত্যিক। কিন্তু তার দাগী শব্দের অর্থ ভাল করিয়া তা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—দাগী! ব্যাপার কি?

সে বলিল—মাছ, ছাগল, পেঁয়াজ, কুমড়ো, সুটকেস, লোটাকম্বল, গাজা—আমি বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। সে সূত্রের ব্যাখ্যার মত বলিয়া চলিল—

—ওইযে দুজনে ডিঙি করে মাছ চুরি করতাম ওই হ'ল কাল। প্রথমবার রায়পুরের বাবুদের পুকুরে মাছ চুরি ক'রতে গিয়ে হ'ল ছয় মাস! বেরিয়ে এসে মাচ ছেড়ে ধ'রলাম মাংস মানে চুরি করা, হ'ল আবার দেড় বছর। বেরিয়ে এসে বুঝলাম সন্ন্যাসীর পক্ষে আমিষটা নিরাপদ নয়, ধরলাম পেঁয়াজ। কিন্তু ওটা আমিষের বাবা। হ'ল তিন বছর! তার পরের বার কুমড়ো—ফল চার বছর! শেষে নিরামিষও ছাড়লাম! তখন সবে সুট্‌কেস্ বাজারে উঠেছে! করলাম চুরি, হ'ল পাঁচ বছর—বুঝলে কান্ত গোড়ায় কাঁচা হে! শেষে বেরিয়ে ভাবলাম দূর ছাই সন্ন্যাসীর আবার ওসবে কি হবে। কিন্তু সন্ন্যাসেরও তো সাজ সরঞ্জাম চাই! সৎ উদ্দেশ্যে অসৎ কাজ করায় ক্ষতিটা কি! লোটা-কম্বল চুরি ক'রতে গিয়ে ধরা পড়লাম। শেষ বার হ'ল এক ছিলিম গাঁজা চুরি ক'রতে গিয়ে! দেশের কি আইন হে! মৌতাত চুরিতে নাকি সাজা হয়! ছোঃ! বদলে ফেলো, বদলে ফেলো অমন আইন। তার পরে তোমার খবর কিহে! সাজ সজ্জা তো ভালই দেখছি! লিখ্‌তে শিখেছ! কি লিখ্‌ছ? তুমি আবার কি লিখবে?

এই বলিয়া সে সেই বহুদিন বিস্মৃত হাসি হাসিল।

—আচ্ছা বল, বল। এই বলিয়া সে একটা বিড়ি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চলে? আমি সম্মতি জানাইলাম।

বেশ, বেশ।

এবার একটা ছোট কল্কে দেখাইয়া বলিল—এটা বোধহয় চলে না?

আমি বলিলাম—চলে বই কি?

সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বটে! বটে! কান্ত তোমার উন্নতি হয়েছে, এ না হ'লে আর সাহিত্যিক! আচ্ছা নাও! এই বলিয়া সে খানিকটা তামাক পাতা ছিড়িয়া বাঁ হাতের তেলোয় ফেলিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঘসিতে লাগিল। ঘসা শেষ হইলে আমাকে খানিকটা দিয়া বাকিটা নিজের মুখে ফেলিয়া দন্ত ও অধরের মাঝে রাখিয়া দিয়া বলিল, তারপর তোমার খবর কি? আচ্ছা সত্যি করে বলতো, কোনটা আগে শিখলে, নেশা না লেখা!

আমি বলিলাম—নেশাটাই তো আগে শিখেছি! অট্টহাস্যে বলিল—বুঝেছি, ওদুটোর মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে হে।

আমি বলিলাম—এখানে বসে গল্প জম্‌বে না, চল বাড়ীতে যাওয়া যাক্‌!

সে বিস্মিত হইয়া বলিল—বাড়ী? বাড়ীও আছে নাকি? অবাক ক'রলে শ্রীকান্ত? কিন্তু ক'রলে কি করে? জুয়ো টুয়ো খেল! না? কোকেনের চোরাই ব্যবসা? না? ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম—তুমি যে, আবার সাহিত্যিক! আমি তো পালাবার আগে শুনিছিলাম তোমার পিশেমশায় তোমাকে পাটের ব্যবসায়ে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। শেষে বুঝি সাহিত্যই বেশী লাভের দেখলে।

আমি ক্ষুন্ন স্বরে বলিলাম—ইন্দ্রনাথ তুমি এ সব বুঝবে না; এতে আর্ট আছে, জনগণের ব্যথা আছে, পতিতার প্রতি দরদ আছে—

—পতিতাও আছে! বাঃ বাঃ—খাসা! আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল! একটু পরে আবার বলিল—সেই যে পশ্চিমে থাকৃতে গোয়াল ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে হরিদাসের গুপ্তকথা পড়েছিলে, সেটা একেবারে মাঠে মারা যায়নি তাহ'লে!

ইন্দ্রনাথ ঠিক ধরিয়াছে। সেই গ্রন্থের নূতন সংস্করণের নাম যে 'সেবাদাসী' একথা লজ্জায় চাপিয়া গেলাম।

সে বলিল, নাও কোথায় তোমার ডেরা, চল যাওয়া যাক। এই বলিয়া সে ঝুলি কাঁধে উঠিয়া দাঁড়াইল! একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া দুইজনে বাড়ী রওনা হইলাম।

২

আমার বাড়ী দেখিয়া ইন্দ্রনাথ অবাক হইয়া গেল; যে ইন্দ্রনাথকে কখনও অপ্রতিভ হইতে দেখি নাই সেও আজ কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁ কান্ত, এ সব কি সত্যই সাহিত্য করে হয়েছে না সঙ্গে আর কিছু ব্যবসা ছিল!

আমি উচ্চাঙ্গের একটা হাসি হাসিয়া বলিলাম—কি যে বল ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্রনাথ দুঃখের সুরে বলিল—আর কি সুযোগটাই ফস্কে গেল। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে না গিয়ে সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করলেই হ'ত।

ইতিমধ্যে সে আমার লিখিবার টেবিলের উপর দুইখানা পা তুলিয়া দিয়া গদি আঁটা চেয়ারে আরামে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছে। বলিল—শ্রীকান্ত সাহিত্যিক হ'লে কি আর ভদ্রতা করতে নেই…

আমি শ্রীকান্তের ইঙ্গিত বুঝিয়া ডাকদিলাম—এই রতন তামাক দিয়ে যা

তামাক খাইতে খাইতে ইন্দ্রনাথ এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল; হঠাৎ চোখে একটা সকৌতুক দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—বলি বিয়ে করলে কবে হে?—

—বিয়ে, বিয়ে তো করিনি!

—তবে কি মালা-চন্দন?

আমি নীরব

—কণ্ঠী বদল?

—কি যে বল!

সে বলিল—বলি কি আর সাধে? বিয়ে করনি তো শাড়ী কেন?

ঠিক বটে রাজলক্ষ্মীর শাড়ী ঝুলিতেছে—চাকরে তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া ইন্দ্রনাথকে বুঝাইব যে শাড়ী কেন? কেমন করিয়া বুঝাইব যে, এ শাড়ী আমার জীবনে অপ্রাসঙ্গিকও নয়, প্রক্ষিপ্তও নয়! সে পুনরায় খোঁচ মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হে উত্তর দিচ্ছ না যে?

আমি বলিলাম—শ্রীঘৃতের নাম শুনেছ?

—হাঁ, দেয়ালে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে

—তবে জেনে রাখো ওই শাড়ীর তত্ত্ব শ্রীঘৃতের মধ্যে আছে।

সে বলিল—ভাই শ্রীকান্ত, আমি সাহিত্যিক নই, সন্ন্যাসী, কাজেই আর একটু স্পষ্ট করে বল।

বাস্তবিক ও কেমন করিয়া এ সব ইন্টেলেকচুয়াল কথা বুঝিবে! ও বালিগঞ্জের বদলে বিন্ধ্যাচলে জীবন কাটাইয়াছে। সোমবার উপবাস করে বটে সোমবাসরে একবারও যায় নাই। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—ভাই ইন্দ্রনাথ, শ্রীঘৃতের বৈশিষ্ট্য এই যে ওতে ভেজাল নেই। বাজারের অন্য ঘিতে আছে। বাঙলা দেশে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত তা ভেজালে পূর্ণ; মন্ত্রের ভেজাল, আচারের ভেজাল, প্রথার ভেজাল, এক কথায় মন্ত্রের দ্বারা মন সেখানে বাধাগ্রস্থ; প্রেমের পরীক্ষা তাতে হয় না—। আমি গ্রহণ করেছি তাকে বিনা মন্ত্রে, বিনা আচারে, বিনা আহ্বানে, বিনা যৌতুকে এমন কি কাউকে নিমন্ত্রন পর্য্যন্ত করিনি। সে সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল—এ প্রথা কি বাঙলা দেশে চলছে? আমি বলিলাম—কেবল এই প্রথাই বাঙলা দেশে চলছে। সে হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিল—ভাই শ্রীকান্ত আমি কিছুদিন বাঙলা দেশ ছাড়া ছিলাম ফিরে এসে দেখছি ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে। কেবল দুঃখ যে আমার যৌবনটা চলে গেছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—দুঃখ করনা ভাই, যৌবন তোমার যায়নি। সে নিজের সম্বন্ধে এত বড় আশ্বাস বাক্য শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। আমি বলিয়া চলিলাম—সৃষ্টি করবার শক্তির নাম যৌবন; আর সৃষ্টি করবার ইচ্ছার নাম প্রেম।

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া দিলাম! যখন সে ও ইন্দ্রনাথ কথাবার্ত্তা বলিতেছে আমি অনেক দিন পরে একবার ভাল করিয়া তাহার দিকে তাকাইলাম—কি মোটা ইস্, নথপরা, মাথার সিঁথির বরাবর

দুই ইঞ্চি প্রশস্ত একটী টাক্, মুখে এক গাল পান আর দাঁতে—দাঁতই নাই! সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! যে দিন বৈঁচি বনে দাঁড়াইরা সে একা কাঁদিতেছিল—সে দিন সে বেশী সুন্দর ছিল না আজ! ঐ রূপের সঙ্গে বার্দ্ধক্য ষড়যন্ত্র করিয়া কি এক গজকচ্ছপী ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু বিবাহে একাধিক বিবাহ করা যায়! খৃষ্টানি বিবাহে বন্ধন ছেদ করা যায়। কিন্তু এই ধরণের অকৃত্রিম প্রাণের মিলনে কোন বন্ধন না থাকায় ছেদন করিবারও কিছু নাই। এক জাতীয় গিরগিটী আছে দুটায় লড়াই বাধিলে একটী না মরা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে। এই অকৃত্রিম মিলনেও সেই দশা—একজনের না মরা পর্য্যন্ত আর একজন ছাড়িবেনা। ইহাকে প্রাণান্ত বিবাহ বলিতে কি আপত্তি, আছে পাঠক?

৩

রাত্রে আহারের পরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া তামাকু টানিতে টানিতে বলিল—কান্ত এবার আসল কথা বল দেখি কেমন করে বই লিখে এত সহজে বাঙালীর হৃদয়ে প্রবেশ করলে?

আমি বললাম—ভাই ইন্দ্রনাথ বাঙালীর হৃদয়ে প্রবেশের এক সোজা পথ আবিষ্কার করে ফেলেছি!

—সোজা পথ!—ইন্দ্রনাথ নড়িয়া চড়িয়া উঠিল!

শোন তবে! আমি বলিতে লাগিলাম,—উদরের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয়ে প্রবেশের পথ আবিষ্কারের গৌরব আমার!

—বল কি হে! বাঙালীর হৃদয় আর উদর তবে কি বড় কাছাকাছি।

শুধু কাছাকাছি নয়! বাঙালীর উদরই হৃদয়!

ইন্দ্রনাথের দুই চোখ আমার দিকে তারিফ বর্ষণ করিতে লাগিল।

আমি উৎসাহিত হইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম—বুঝলে ইন্দ্রনাথ বর্ম্মা মুল্লুক থেকে ফিরে বুঝতে পারলাম যে এ জাতিটা আজ দেড়শ বছর থেকে অনাহারে আছে। ফলে হয়েছে এই যে তার হৃদয় নামতে নামতে উদরে এসে ঠেকেছে! তখনি বুঝতে পারলাম যে এদের মনে প্রবেশ করতে হ'লে উদর দিয়ে প্রবেশ করতে হবে! কাল তোমাকে আমার গ্রন্থাবলী এক সেট দেবো—পড়লেই কথাটা বুঝতে পারবে! বুঝবে ইন্দ্রনাথ এই নিরন্ন জাতের কাছে খাদ্যের চেয়ে বড় কিছু নেই—এদের কাছে অন্নই ব্রহ্ম।

আমার অভয়া দেখো ঘোর অনাটনের মধ্যেও প্রেমিককে লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছে! 'পরিণীতা'র মধ্যে একটা গরীবের মেয়ে আছে সে 'দাদা' 'দাদা' বলতে বলতে বড় লোকের ছেলে শেখরের টাকার আলমারির চাবি হাত করে ফেলেছে!

রমাকে দিয়ে রমেশকে খাওয়াবার সুযোগ পাইনি বলে দুজনকে সেই তারকেশ্বর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে!

নরেন ডাক্তার মেসে পেটভরে খেতে পায় না এই কথাটা বিজয়াকে কেঁদে ককিয়ে জানিয়ে দিয়ে বাজি মাৎ করে দিয়েছে! এ জাতের উদরেই প্রেম!

—তার চেয়ে বল ঔদরিক প্রেম! এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল!

আমি বলিলাম—হাসির কথা নয় ইন্দ্রনাথ।

সে বলিল—নয়ই-তো! আচ্ছা কান্ত এদের হৃদয়ের অধোগতি তো শুনলাম, মস্তিষ্কের অবস্থা কি!

—সে-ও ওই একই নিয়ম অনুসরণ করছে। অর্থাৎ কিনা মস্তিষ্ক নামতে নামতে হৃদয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের বুদ্ধিতে আপীল করতে হলে হৃদয়ে ঘা দিতে হয়। আমার সাবিত্রী, কিরণময়ী, কমলা, কমলিলতা, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে এজাতের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে! কাল দেবো পড়ে দেখো! কি ইন্দ্রনাথ ঘুম পাচ্ছে নাকি!

এ সব কথা শুনলে মরা মানুষ জাগে আর আমার ঘুম পাবে! সে কি!—ইন্দ্রনাথ বলিল।

এইরূপে অনেক রাত ধরিয়া ইন্দ্রনাথকে পতিতাতত্ত্ব, দরদ, অন্নব্রহ্ম, প্রেম (স্বাধীন ও পরাধীন) প্রভৃতি মদীয় আবিষ্কৃত সূত্রগুলি বুঝাইলাম। তাহাকে একটু গড়িয়া পিটিয়া লইতে হইবে—ইতিমধ্যে সে যদি বর্ণ জ্ঞান ভুলিয়া না থাকে তবে চাইকি তাহাকে সাহিত্যিক বলিয়া চালাইয়া দিতেও পারিব।

সব কথার মধ্যে আমার প্রেমের ডেফিনেশনটাই যেন তাহার কিছু বেশি মনে লাগিল—সে বারংবার সেটা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল!

আমি বলিলাম—তুমি ঘুমোও, আমি আসি।

সে বলিল—আচ্ছা বিদায়!

আমি বলিলাম—বিদায় কি হে! কাল সকালেই আবার দেখা হবে!

সে হাসিয়া বলিল—ওই হোল।

৪

ভোর বেলা উঠিয়া ইন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া দেখি ঘর খালি। কোথায় গেল? প্রাতভ্র্মণে নাকি? রাজলক্ষ্মীর সন্ধান লইতে গিয়া দেখি সেও নাই, গেল কোথায়? ইন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া দেখি তাহার ঝুলিটিও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ঘরে একটা টেবিল ছিল তাহার উপরে একখানা চিঠি; চিঠিখানি ইন্দ্রনাথের গাঁজার কল্কে দিয়ে চাপা-দেওয়া; উঠাইয়া দেখি ইন্দ্রনাথ লিখিতেছে—

ভাই শ্রীকান্ত, তোমার প্রেম ও যৌবনের ডেফিনেশন্ যেমন সান্ত্বনাদায়ক তেমনই চিত্তাকর্ষক। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য রাজলক্ষ্মীকে লইয়া সরিয়া পড়িলাম। আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই কল্কেটী রাখিয়া গেলাম। আর কোন কাজে না লাগে কাগজচাপার কাজে লাগিবে। ইতি

তোমার ইন্দ্রনাথ

আর এক টুকরা কাগজে রাজলক্ষ্মী লিখিতেছে—সেদিন বৈঁচির মালা দিয়া যাহাকে বরণ করিয়াছিলাম আজও তাহাকে পাই নাই। এখন দেখিব সে মালা বিনাসূতার গাঁথা কি তার মধ্যে বন্ধন আছে? তুমি রোহিণীকে হত্যা করিবার জন্য গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিতে পার নাই— দেখিব নিজে কি কর। মনে রাখিও মহৎ প্রেমের প্রাণ ব্যর্থতায়! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। ইতি

হতভাগিনী রাজলক্ষ্মী

পুঃ—তোমার বালিশের তলে সিন্দুকের চাবি রহিল। আর ভাঁড়ার ঘরের পশ্চিমের আলমারীর উপরের থাকে বাঁদিক হইতে দ্বিতীয় হাঁড়িতে সরের নাড়ু রহিল ও তৃতীয় থাকে কাঁচের বয়ামে কুলের আচার রহিল। মাথা খাও—খাইও। ইতি

ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ তুমিই প্রকৃত পরার্থপর, পরোপকার তোমার পক্ষে এমন সহজাত! যে রাজলক্ষ্মীকে আমি আস্ত চার চারটা পর্ব্ব বহন করিয়া বিরক্ত হইয়া তাড়াইবার পথ খুঁজিতেছিলাম তুমি এমন সহজে তাহার সমাধান করিয়া দিলে! প্রেমসমুদ্রে যে-হলাহল ওঠে তুমি সত্যই তাহার নীলকণ্ঠ।—জীবনে এমন আনন্দ খুব অল্পই পাইয়াছি। সারা বাড়ীময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। চাকরটা ভাবিল আমি রাজলক্ষ্মীর শোকে ক্ষেপিয়া গিয়াছি। আনন্দ যে কতখানি হইয়াছিল তাহা একটী ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। রাজলক্ষ্মীর পত্রোক্ত সরের নাড়ু ও কুলের আচার সবগুলি খাইয়া ফেলিলাম। জীবনে এই প্রথম তাহার কথা রাখিলাম। আনন্দ একটু কমিলে প্রথমেই মনে হইল—বাড়ী ছাড়িতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এ সহর ছাড়িতে হইবে। কেন না ইন্দ্রনাথই হও আর নীলকণ্ঠই হও—বাবা! রাজলক্ষ্মীকে হজম করিতে পারিবে না। ফিরিয়া আসিয়া আবার না আমার হৃদয় মন্দিরে সে রাহাজানি করিয়া ঢুকিয়া পড়ে!

"ন-ন-লৌ-ব-লিঃ"

স্বর্গের নন্দন বনে পারিজাত বৃক্ষতলে আজ বড় ভিড়। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকল বয়সের দেবতা সমবেত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম স্বর্গে কেহ বৃদ্ধ হয় না; বুঝিলাম স্বর্গ সম্বন্ধে যে সব গুজব শোনা যায়, তার সবগুলি সত্য নয়। কিসের জন্য এ জনতা? দেবতারা কি পারিজাত পুষ্প চয়নের জন্য আসিয়াছেন? না স্বর্গীয় মধুচক্র ভাঙিবার জন্য কোন দুরন্ত দেব-শিশু বৃক্ষে উঠিয়াছে সকলে তাহাকে দেখিতেছে? কিংবা ও সব কিছুই নহে, পারিজাতের ডালে একখণ্ড কাগজে এক খানা বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে। সেই বিজ্ঞাপন পড়িবার জন্য এই ভীষণ দৈব জনতা।

তবে কি স্বর্গেও বেকার সমস্যা দেখল নাকি? অসম্ভব নয়! স্বর্গের সনাতন জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটি বাড়িয়া তেতাল্লিশ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে; তারপরে মন্দাকিনীতে তো বন্যা লাগিয়াই আছে। বিশেষ দেবদৈত্যের সেই মহাযুদ্ধের পর হইতে স্বর্গের পরমার্থিক অবস্থা (স্বর্গের অর্থকে পরমার্থ বলে) দিন দিন খারাপ হইয়া চলিয়াছে; স্বর্গের অবস্থা আজ বড় শোচনীয়।

বিজ্ঞাপনখানার কাছে যাইবার জন্য বড়ই ঠেলাঠেলি পড়িয়া গিয়াছে; ব্যবহারের বেলায় দেখিলাম দেবতারা মানুষেরই মত; হুড়াহুড়িতে কাহারো উত্তরীয় ছিঁড়িল; কাহারো চুল ছিঁড়িল; এক ব্যক্তি মরিবার সময় 'নেকটাইয়ের' মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই 'নেকটাই' ধরিয়া অন্য সকলে তাহাকে সরাইয়া দিল; একজন বৃদ্ধের ট্যাঁক হইতে অমৃতের

ডিবা খোয়া গিয়াছে বলিয়া সে বড়ই হৈ চৈ করিতে লাগিল; সবশুদ্ধ মিলিয়া যেন সিনেমায় চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট করিবার দৃশ্য। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনখণ্ড সমীরণে মৃদু মন্দ দুলিতেছে; সেখানা এই রকমের :—

কর্ম্মখালি

আবশ্যক—ন-ন-লৌ-ব-লিঃ-এর জন্য তিন জন সাধু, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী কর্ম্মী চাই। সত্বর হাতে লিখিয়া সার্টিফিকেটের নকলসহ কত বয়স, কোন জেলায় বাড়ী, পূর্ব্বের অভিজ্ঞতাসহ দরখাস্ত করুন। মাসিক বেতন গুণানুসারে।

বিঃ দ্রঃ—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে কোনরূপ ব্যক্তিগত ক্যানভাস চলিবে না।

অস্পষ্ট স্বাক্ষর—ন-ন-লৌ-ব-লিঃ প্রধান কর্ম্ম সচিব।

বিজ্ঞাপনখানা একটু বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাপন করা উচিত। ন-ন-লৌ-ব-লিঃ আর কিছুই নহে—নন্দননরক লৌহবর্ত্ম লিমিটেডের সংক্ষিপ্তরূপ। সকলেই জানেন, যে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে দূরত্ব অনেক, যাতায়াতের পথ ঘাট ভাল নয়। কিছুকাল হইল স্বর্গে ডিমোক্রেসির প্রভাবে এই দুই স্থানের মধ্যে যোগ করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের চোখ হাজার জোড়া কিন্তু কান মাত্র দুটী! তিনি কোন আবেদন নিবেদন কানেই তোলেন না; দেবগণ যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এমন সময়ে একদিন মর্ত্তের সর্ব্বাধিক প্রচারিত একখানি দৈনিক পত্র সেখানে গিয়া পড়িল। উহা পাঠ করিয়া দেবগণ আবার কোমর কসিয়া

লাগিয়া গেল। ফলে স্বর্গের অমৃতের দোকানে পিকেটিং হইল; উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি মহিলাগণ সভাগৃহের চেয়ার টেবিল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন, স্বর্গের কয়েকটী শিশুদেবতা ঢিল ছুঁড়িয়া স্বয়ং ইন্দ্রের খাস কামরার কাঁচ ভাঙ্গিয়া দিল। আর সকলকে ছাপাইয়া স্বর্গের বিখ্যাত কবি (ইঁনি দেবাসুরের যুদ্ধে ট্রেঞ্চ খনন করিয়াছিলেন) নানা ভাষার খিঁচুড়ি করিয়া এমনি সিংহনাদ করিলেন যে সপারিষদ ইন্দ্রের টনক নড়িল। নন্দন নরকের মধ্যে লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হইল।

নন্দন নরকের যোগস্থাপনের পর হইতে স্বর্গের দ্বারপালের কাজ বাড়িয়া গেল। অনেক অবাঞ্ছিত লোক নরক হইতে আসিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল; স্বর্গে চুরি, খুন, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দৈনিকের সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিলেন। ফলে কয়েকজন অতিরিক্ত দৌবারিক নিযুক্ত হইল; কিন্তু তাহারা ঘুষের বশ, সমস্যা যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল। তখন ন-ন-লৌ-ব-লিঃ র কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন এমন সব ব্যক্তিকে দ্বারবান করিতে হইবে যাহারা ঘুষের বশবর্ত্তী নয়, অর্থাৎ সাধু, সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী··· ইত্যাদি এইরূপ কয়েকজন লোক চাহিয়া ঐ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।

স্বর্গের ঘর বাড়ী, রাস্তা ঘাট, প্রাচীরগাত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী পরিল; সম্ভব অসম্ভব সব স্থানে বিজ্ঞাপন দেখা দিল। যেন এক রাত্রের মধ্যে স্বর্গীয় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া চর্ম্মরোগ দেখা দিল। ইন্দ্রের রথে, ঐরাবতের পিঠে, উচ্চৈঃশ্রবার কণ্ঠে, নারদের ঢেঁকিতে সর্ব্বত্র কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন। স্বর্গে বড় হৈ চৈ লাগিয়া গেল।

ন-ন-লৌ-ব-লিঃ হেড আফিসে রাশি রাশি দরখাস্ত আসিতে লাগিল; যে কয়জন কর্ম্মচারী ছিল তাহারা আর পারিয়া ওঠে না। শেষে এই দরখাস্তের জন্য একটি নূতন বিভাগ খোলা হইল এবং কলিকাতার সরকারী দপ্তর খানার দুইজন সুদক্ষ কেরাণীকে বিনা নোটিশে ট্রামচাপা দিয়া 'রিকুইজিশন' করা হইল। যথা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে দরখাস্ত বিবেচনা করিবার জন্য কমিটী বসিল। তিন জন কর্ম্মচারীর জন্য একলক্ষ দরখাস্ত পড়িয়াছে। স্বর্গের বেকার সমস্যা বাংলা দেশের অপেক্ষাও তীব্রতর!

২

'সিলেকশন' কমিটী সাত দিন অধিবেশন করিয়া বার খানা দরখাস্ত বাছিয়া বাহির করিল। বার জনই প্রসিদ্ধ লোক; পৃথিবীতে এককালে তাহাদের সচ্চরিত্র পরিশ্রমী যুবক বলিয়া খ্যাতি ছিল।

কে সেই সৌভাগ্যবান্ দ্বাদশ জন? পাঠক্ শ্রবণ করুন—সক্রেটিস, সিজার, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, লর্ড কিচেনার, যুধিষ্ঠির, জোয়ান অফ্ আর্ক, আব্রাহাম, নেবুকার্ডনেজার হাউপ্টম্যান ও মার্টিনলুথার! এই বার জনকে লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের মহা মুস্কিল হইল, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখেন। প্রশংসা পত্রে কেহ কম যায় না; প্রশংসা পত্র পড়িয়া শিশুবার্গের পুত্রহন্তা হাউপ্টম্যানকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া মনে হয়।

শেষে কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন যে, তিন জন সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম বেতনে কাজ করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগকে লওয়া হইবে। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির নিম্নতম বেতনে রাজী হইল—অন্য সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

ইঁহাদের প্রশংসা পত্রের জোর বড় অল্প নয়। যুধিষ্ঠির ভীষ্ম হইতে ভাণ্ডারকর পর্য্যন্ত অনেকের সার্টিফিকেট ভরিয়া দিয়াছে। সে মহাভারত হইতে শ্লোক তুলিয়া নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে, কেবল 'ইতি গজের' ইতিহাসটী চাপিয়া গিয়াছে। স্বর্গে গিয়া যুধিষ্ঠিরের কিছু বুদ্ধি হইয়াছে মনে হয়; ভীষ্ম লিখিয়াছে বেচারী সারা জীবন কষ্ট পাইয়াছে, এখন একটী চাকুরী পাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

বুদ্ধ ত্রিপিটক হইতে নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে। অশোক, বিম্বিসার, রীজডেভিডস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, এমনটী আর পাইবে না।

যীশুখৃষ্টের প্রশংসা পত্রই সব চেয়ে চমকপ্রদ। কারণ ও বিদ্যায় ইউরোপীয়েরা শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং পন্টীয়াস পাইলেট লিখিয়াছে, আমি ভুল করিয়া লোকটাকে বিচার ছলে খুন করিয়াছি। সেজন্য এখন অনুতপ্ত। বার্ণাডশ বলিয়াছে—যীশুই প্রথম সোসালিষ্ট, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। চেষ্টারটন লিখিয়াছে যীশুই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী, যদিও তাহা অধ্যাত্ম সাম্রাজ্য, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। যীশু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া একখানি পকেট সংস্করণের বাইবেল দরখাস্তের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে।

এক দিন স্বর্গের অধিবাসীরা দেখিল ন-ন-পৌ-ব-লিঃর তিন জন নব

নিযুক্ত দৌবারিক কোম্পানীর উর্দ্দি পোষাক ও টুপি পরিয়া ষ্টেশনের তিন দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইল, দুর্বৃত্তগণ চিন্তিত হইল; স্বর্গের পুরুষেরা গ্রন্থিও মেয়েরা নীবী সম্বন্ধে স্বস্তি অনুভব করিল।

সেদিন সকালে নন্দন-নরক মেল যথা সময়ে নন্দন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। যাত্রীরা পৃথিবীর অভ্যাস ভুলিতে পারে নাই। সকলের মুখেই একটা গেল গেল ভাব; যাহাদের স্বর্গে প্রবেশের টিকিট ছিল তাহারা নিজের নিজের বোঝা (পুণ্যের বোঝা) লইয়া সগৌরবে দ্বার অতিক্রম করিল। কেবল একটী লোক সন্দেহজনক ভাবে আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল। লোকটার হাঁটুলম্বী পাঞ্জাবী, পরণে লুঙি, দুই পায়ে দুই ধরণের নাগরাই জুতা, আর কানে গোজা অর্দ্ধদগ্ধ একটী বিড়ি। যাত্রীরা চলিয়া গেল ছকু খানসমা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যুধিষ্ঠির গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল—টিকিট? ছকু ট্যাঁকে (যুধিষ্ঠিরের নয় নিজের) হাত দিয়া একটী সিকি বাহির করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে চোখ মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল বলি দাদার রেট কত ক'রে? যুধিষ্ঠির অবাক হইয়া বলিল রেট! টিকিট কই? ছকু ঘুঁষ-দাতাদের চির পরিচিত সেই হাসি হাসিয়া বলিল—বলি মোচড় দিয়ে কিছু বেশী নেবার চেষ্টা আচ্ছা না হয় দু' ছিকি (সিকি) হবে? অপমানিত যুধিষ্ঠির সক্রোধে হিন্দিতে বলিল নেই হোগা।

তখন ছকু বুদ্ধের নিকটে গিয়া পুনরায় ঐরূপ বলিল; বুদ্ধ সব শুনিয়া বিশুদ্ধ পালি ভাষায় বলিল, "অসম্ববব।" এবার ছকু খৃষ্টের নিকটে গিয়া একটী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল, প্রণামান্তে স্বর্গে প্রবেশের

পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক আরম্ভ করিল; বেচারা যীশু স্বর্গে আসিবার পর হইতে ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সুযোগ পায় নাই; তর্ক করিতে করিতে সে যেমনি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে অমনি ছকু এক ছুটে দরজার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে বেশী দূরে যাইতে পারিল না, যীশু তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল, অপর হাত দিয়া ছকু দরজার রেলিং ধরিল। যীশু তাহাকে টানে সে কিছুতেই রেলিং ছাড়ে না। তাহার দেহের খানিকটা স্বর্গের মধ্যে খানিকটা বাহিরে। যীশুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া দুই জনে তাহার দুই পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন উঃ কি টানাটানি! ছকু এক হাত দিয়া রেলিং ধরিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, আর যীশু বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির তাহার দুই পা ও এক হাত ধরিয়া প্রাণপণে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। বাপ্‌রে ছকুর এক হাতে কি জোর! যে হাতে মর্ত্তে থাকিতে সে বহু লোকের গ্রন্থিছেদন করিয়াছে, পকেটসন্ধান করিয়াছে, সিঁধকাঠি চালনা করিয়াছে সে হাত আজও তাহার বেহাত হয় নাই। যীশু, বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির পরিশ্রান্ত হইয়া দরদর করিয়া ঘামিতে লাগিল। তামাসা দেখিবার জন্য একদল লোক জড় হইল; সকলেই বলিতে লাগিল কোম্পানী এত দিনে বিশ্বস্ত লোক পাইয়াছে বটে! কিন্তু ব্যাপারটার কোনো মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া দর্শকদের মধ্যে হইতে একজন (বোধহয় বাঙালী) বলিয়া উঠিল কাতুকুতু দিন মশায় কাতুকুতু দিন ইহা শুনিয়া যীশু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ছকুর বকলে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করিল অমনি কোথায় গেল ছকুর মরীয়া ভাব! কোথায় গেল ধর্ম্মবীরকে পরাজয়কারী বাহুর বল, সে হাসিতে হাসিতে রেলিং ছাড়িয়া দিল। তখন তিন জনে মিলিয়া

তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহাতে ছকু মোটেই রাগিল না, সে হাত দিয়া অবিন্যস্ত পাঞ্জাবী ও টেরি ঠিক করিতে করিতে কান হইতে আধপোড়া বিড়িটী খুলিয়া লইয়া যীশুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ম্যাচিস হ্যায় ? যীশুর নিকটে অনুতাপের অনল ছাড়া আর কোন প্রকার আগুনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে হতাশ ভাবে সরিয়া পড়িল।

ছকু সরিয়া পড়িলে, যীশু অন্য দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই লোকটা একটা সিকির (ছিকি) কথা কি বলছিল ? বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির এক সময়ে রাজার ছেলে ছিল, কাজেই সংসারের রীতিনীতি কতক কতক তাহারা জানিত—তাহারা বলিল—উহাকেই বলে ঘুষ খাওয়া। যীশুর দিব্যদৃষ্টির উদয় হইল সে বলিল—বটে, বটে এতদিনে আমার বিশ্বাস হইতেছে, জুডাস বেটা আমাকে ধরাইয়া দিবার পুর্ব্বে ঘুষ লইয়াছিল। সেদিনের মত তাহাদের Duty শেষ হইল। তাহারা নিজেদের মেসে ফিরিয়া গেল।

পর দিন সকালে পুনরায় নন্দন-নরক মেল নন্দনে আসিয়া থামিল। পুণ্যের বোঝায় পীড়িত যাত্রীরা স্বর্গে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের অন্যতম পঞ্চানন বাবাজী স্বর্গে প্রবেশ করিবে এমন সময়ে খৃষ্ট তাহাকে বাধা দিল; পঞ্চানন বলিল আমাকে নিষেধ কর কেন বাপু ! আমি সারা জীবন ধর্ম্মাচরণ করিয়াছি, জীবনে এক পয়সা উপার্জ্জন করি নাই কেবল ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়াছি; নিজের পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছি এবং পরের পঞ্চাশজন পত্নীকে বৈষ্ণবী করিয়াছি; ভিক্ষায় যে সাত হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহার এক পয়সাও খরচ করি নাই—কিংবা দান

করি নাই ; স্বার্থ ছাড়া কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। অপরে মিথ্যা কথা বলিলে রীতিমত রাগিয়াছি ; জীবনে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অভিনয় করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়া তবেই চুরি করিয়াছি ; পরের ধর্ম্ম ছাড়া কখনো নিজের ধর্ম্মের নিন্দা করি নাই ; প্রত্যহ গঙ্গস্নান করিয়াছি ; গঙ্গাস্নান হইতে এখনি আসিতেছি। (বাবাজী সাঁতার দিয়া একটী নারিকেল ধরিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে) তবে কেন আমায় থামাও বাপু! খৃষ্ট বলিল—আপনার কথা ঠিক ; স্বর্গে প্রবেশ করিবার আপনার সব গুণই আছে ; আপনাকে আটকাই এমন কি সাধ্য? কিন্তু হাতের কাকাতুয়াটীকে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না' বাবাজী রাগিয়া উঠিল কে তুমি বেল্লিক? কি নাম বট হে? খৃষ্ট বিনীত ভাবে উত্তর দিল—খৃষ্ট! বাবাজী একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, রামঃ ছিঃ ছিঃ কি সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড কারখানা! শেষে এ বেটা খ্রীষ্টানকে এরা দরজায় দাঁড় করাইয়াছে? এমন জানিলে শেষে কে স্বর্গে আসিত! ইহার চেয়ে আমার সনাতনপুরে আখড়া ছিল ভাল! আমার কমলমণি সেবাদাসীর বয়স কেবল হইয়াছিল যোল। হায়! হায়!

বাবাজী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এবার কাকাতুয়া চিৎকার করিয়া উঠিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'। বাবাজী হঠাৎ সেবাদাসীর শোক ভুলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—দেখিলে তো বাপু আমার কাকাতুয়াটী কেমন আধ্যাত্মিক পাখী। তার পর গলার স্বর একটু নামাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—উর্ব্বশীকে দেখিতে কেমন? বলি বয়স কত? খৃষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল আপনি পাখীকে আধ্যাত্মিক বলিলেন

বটে, কিন্তু পশু পাখীর তো আত্মা নেই। মানুষের আত্মা পুণ্যের বলে স্বর্গে আসে ; পশু পাখীর আত্মা না থাকায় তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া?

গোলমাল শুনিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী সকলের পরিচয় লইল! তখন চার জনে মহা বিতর্ক বাধিল, মনুষ্যেতর প্রাণীর আত্মা আছে কিনা?

বাবাজী যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম এই:—মানুষের আত্মা যদি থাকে, অসভ্য ও বর্ব্বর, কোল্ ভীল, সাঁওতালদের আত্মা আছে কিনা? তা যদি থাকে, তাদের নিম্নে যারা আছে বানর শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বনমানুষ তাদের আত্মা আছে কিনা? আর যদি বানর জাতির আত্মা না থাকে তবে তাদের উপরে অবস্থিত অসভ্য ও বর্ব্বরদের কেন থাকিবে? (বাবাজী ডারউইন জানে) খৃষ্টরা তিন জন নীরব। তখন বাবাজী বলিল, বাপু তুমিতো বলিয়াছ যে উষ্ট্রও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে 'কিন্তু ধনীরা পারে না ; তবে? তারপর দেখ ইন্দ্রের হাতী আছে, ঘোড়া আছে, তারা কি পশু নয়? বিষ্ণুর গরুড় আছে সে পাখী নয়? আর আর বৈশ্বানরের বাহন ছাগ। এবার বাবাজীর চোখ একটু হাসিল। (হায়, এইরূপ হাসির বলেই সে নব নব সেবাদাসী সংগ্রহ করিয়াছে) বলিল—বলি বুঝলে তো?

বাবাজীর কথা শুনিয়া খৃষ্ট বুঝিল,—বাবাজীকে ঠেকাইবার আশা সফল হইবে না। সে অগত্যা বাবাজীকে পথ ছাড়িয়া দিল। দরজায় ঢুকিবার সময় আধ্যাত্মিক কাকাতুয়া একটি তীক্ষ্ণ ঠোকর মারিয়া খৃষ্টের হাতে রক্ত বাহির করিয়া দিল। বাবাজী সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, বলি সে কথার তো জবাব দিলে না। খৃষ্ট হাতের রক্ত চাপিতে চাপিতে বিরক্ত হইয়া বলিল—জাঁনি কিন্তু বোঁলব না। বাবাজী উত্তর না পাইয়া বকিতে বকিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

[খৃষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ততায় স্বর্গে অবাঞ্ছিত লোক প্রবেশ করিতে পারে না। স্বর্গে অপরাধের সংখ্যা কমিয়া গেল। রেল কোম্পানীর সুনাম বাড়িয়া গেল, তাহারা ভাড়া দ্বিগুণ করিয়া দিল এবং কর্ম্মচারীদের মাহিনা অর্দ্ধেক করিয়া দিল কিন্তু কর্ম্মচারী তিন জনের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল! তাহাদের দিন যায়, কিন্তু রাত্রি যায় না।]

৩

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন কুড়ি মন্দাকিনীর টাট্‌কা ইলিশ মাছ আনিয়া বুদ্ধদেবের কাছে রাখিল। বুদ্ধদেব বলিল আমি মাছ খাই না—সে বলিল মাছ না খান ডিম খান, 'ওতে দোষ নাই, ডিমটা নিরামিষ। খৃষ্টকে একজন একটি সদ্যজাত গোবৎস ও এক ভাঁড় তাড়ি উপহার দিল। খৃষ্ট দয়ালু, না লইলে লোকটা দুঃখিত হয়, গ্রহণ করিল। আর একদিন আর একজন তাহার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিল, খৃষ্ট বলিল—ইহাকে কি ঘুষ বলে? সে জিভ কাটিয়া বলিল—কি সর্ব্বনাশ আপনাকে কি ঘুষ দিতে পারি? ইহা পান খাইবার জন্য কিঞ্চিৎ। গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই কি বল? লোকটা বলিল—কিছু না স্যার! বাংলাদেশ

নামে এক দেশ আছে সেখানকার দারোগারা ঘুষের নাম শুনিলে রাগিয়া ওঠে, কারণ তাতে চাকরী যাইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু পান খাইবার জন্য এমন অনেক কিঞ্চিৎ নেয়, দোষের হইলে ইংরেজের দারোগা এমন করিতে পারিত ?

আর একদিন একজন যুধিষ্ঠিরের নিকটে সুবৃহৎ এক ডালা বোঝাই ফল, মূল তরকারী, ফুল (ফল ফুলের নীচে গোপনে মা দ্রৌপদীর জন্য একখানি ঢাকাই শাড়ী ও একজোড়া অনন্ত ও কানের দুল) উপস্থিত করিল। যুধিষ্ঠির গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল ইহাত ঘুষ। আধারবাহক আভূমি প্রণত হইয়া বলিল—স্যার না গ্রহণ করেন তো ক্ষতি নাই, কিন্তু ইংরেজের অপমান করিবেন না। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিল—ইংরেজ কে!

লোকটা বলিল—আপনার পরে এখন যারা ভারতবর্ষের রাজা।

যুধিষ্ঠির বলিল—তাহাদের কথা কি বলিতেছ ? সে বলিল ইংরেজের হাকিম ঘুষ্ নেয় না, ডালা গ্রহণ করে। যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হইয়া ডালা গ্রহণ করিল। বাসায় গিয়া যুধিষ্ঠির দেখিল ফল ফুলের তলে শাড়ী অলঙ্কার। বুঝিল ডালার ইহাই নিয়ম। পরদিন আর এক জন ডালা আনিল, যুধিষ্ঠির প্রথমেই ফলমূল তুলিয়া দেখিল—শাড়ী ও অলঙ্কার আছে কিনা ; না দেখিতে পাইয়া পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

আর একদিন বুদ্ধদেবের ভিক্ষা পাত্রে এক ব্যক্তি কয়েকটী মোহর দান করিল। বুদ্ধদেব করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি বিস্তার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বৎস ইহাকে কি উৎকোচ বলে না ? লোকটা তাহার পদধূলি

গ্রহণ করিয়া বলিল—প্রভু, ইহার নাম ভালোমানুষি। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—ভালোমানুষি লওয়া কি অপরাধের? লোকটা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল সে কি প্রভু! পৃথিবীতে আদালতের কর্ম্মচারী পেস্কার প্রভৃতি মহাজনেরা ভালোমানুষি ছাড়া কোনই কাজ করে না; ইহা গ্রহণে অপরাধ দূরে থাকুক না করিলেই মহাপাতক; আদালতের মহাজনদের পুণ্য জীবনকাহিনী আপনি জানেন না বলিয়াই এমন কথা বলিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব তাহাকে করপদ্ম তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এমনি করিয়া দিন যায়, বুদ্ধ, যীশু, যুধিষ্ঠির ঘুষ গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে পান খাইবার অর্থ, ডালা ও ভালোমানুষি আদায় করে। শেষে এমন হইল যে, তাহারা আর উহা না পাইলে 'বনাফাইডি' স্বর্গ যাত্রীদের পথ ছাড়িয়া দেয় না। আর যাহাদের টিকিট নাই, তাহারা অনায়াসে কিছু কিছু দিয়া স্বর্গে অনধিকার প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে স্বর্গের দৌবারিকত্রয় মোহর না পাইলে গ্রহণ করিত না, কিন্তু কিছু কাল পরে টাকা, সিকি, কুমড়ো, লাউ, বেগুন লইয়া পথ ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। স্বর্গে আবার চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া গেল, স্বর্গের পুলিশ ব্যতিব্যস্ত

হইয়া উঠিল। স্বর্গীয় দৈনিকের সম্পাদক স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পুলিশকে আক্রমণ করিয়া কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিল।

ন-ন-লৌ-ব-লিঃর কর্তৃপক্ষ পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ব্যাপার কি? এসব চোর ডাকাত ঢুকিতেছে কোন পথে! যে তিনটি দরজা আছে তাহাতে তিনজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান্। তবে কি তাহারাই ঘুষ খাইতেছে? না না তাহা কখনও সম্ভব নহে। প্রশংসাপত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাইবেল, মহাভারত ও ত্রিপিকটে যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাতে ঘুষ খাইবার কথা কিছুতেই মনে হয় না। তবে কি? রেল কোম্পানীর প্রধান ম্যানেজার স্থির করিলেন এবার তিনি তিনজনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ব্যাপার কি?

পরের দিন নন্দন-নরক মেল আসিয়া পৌঁছিলে, ম্যানেজার চোরের ছদ্মবেশে (ধনী ম্যানেজারের পক্ষে চোরের বেশটাই হয়তো আসল) স্বর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল! যীশু তাহার পথরোধ করিয়া বিশুদ্ধ বাইবেলী ইংরাজীতে বলিল—তোমার টিকিট কোথায়? ছদ্মবেশী ম্যানেজার ভীত ভাবে এদিক ওদিক দেখিয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিল, সিকি দেখিয়া যীশু রাগিয়া বলিল—আমি ঘুষ লইব না। কিন্তু লোকটা নেহাৎ চলিয়া যায় দেখিয়া আবার বলিল—তবে যদি পান খাইতে কিছু দাও সে, হাঁ সে স্বতন্ত্র কথা। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল—তাহাতে কি স্বর্গে ঢুকিতে পারিব?

যীশু তাম্বুলবিহারী হাসি হাসিয়া বলিল—স্বর্গ তো দরিদ্রের জন্যই, তুমি কি বাইবেল পড় নাই? ম্যানেজার তাহাকে সিকিটী দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পর দিন আবার ম্যানেজার ট্রেণের টাইমে ছদ্মবেশে বুদ্ধদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, টিকিট? লোকটা বলিল—টিকিট নাই তবে স্বর্গে প্রবেশের ইচ্ছা আছে।

বুদ্ধদেব স্পষ্টভাষী লোক, বলিল—দেখো বাপু আমি ঘুষ খাই না, তবে ভালমানুষি বলিয়া কিছু দিয়া থাকিলে লইয়া থাকি।

ম্যানেজার বলিল পয়সা তাহার কাছে নাই। বুদ্ধ রাজার ছেলে উনত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে ছিল, কাছারীতে খাজনা আদায়ের রীতি তার অজানা নয়, বিপদ কালে প্রজারা কোথায় টাকা রাখে সে জানে, সে লোকটার কাছা নাড়া দিলে টুক করিয়া একটী সিকি পড়িল। বুদ্ধদেব তাহা তুলিয়া কানে গুজিয়া লোকটাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যাও বৎস, তোমার স্বর্গ বাস অক্ষয় হোক।

তার পর দিন ম্যানেজার পূর্ব্বোক্ত ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির তাহাকে দেখিয়া বলিল—দেখ বাপু তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি টিকিট তোমার নাই, আমি ঘুষ লইনা কিন্তু আমি ডালা লই! ডালা কোথায়? তখন অনেক দরদস্তুর করিয়া ডালার বাবদ নগদ সাত সিকি পয়সা যুধিষ্ঠির আদায় করিয়া লইল। ম্যানেজার স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পর দিন ন-ন-লো-ব-লিঃর আফিসে ম্যানেজার সব কথা খুলিয়া বলিল। সভায় স্থির হইল যে, যীশু, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরকে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক। তিন জনেরই চাকরী গেল। তাহারা কোম্পানীর কোর্ত্তা, টুপি প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া মৌলিক গেরুয়া ও ঝুলি লইয়া পথে বাহির হইল। এখন কোথায় যায়, কি করে? এমন সময় দেখিল একদল বালক, বৃদ্ধ ও

যুবক হারমোনিয়ম, খোল, খঞ্জনী লইয়া বাহির হইয়াছে, বন্যার জন্য ভিক্ষা করিতেছে তাহারা, দোতালার জানলার দিকে তাকাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে গাহিতেছে :—

মন্দাকিনীর বন্যাতে আজ
হন্যা দিল স্বর্গলোকে।
কোমড় জলে দাড়িয়ে দেখ
খাচ্ছে খাবি কতই লোকে
দাও জননী ছিন্নবাস
দাও জননী চালের রাশ
লক্ষ্মী দিন ছিন্ন শাড়ী,
সরস্বতী করুণ শ্লোকে

স্বর্গের উত্তর বঙ্গে বন্যা আসিয়াছে।

ভিক্ষার ঝুলিতে চাল পরিতেছে, ডাল পড়িতেছে, দু' একখানা ছেঁড়া শাড়ীও পড়িতেছে। যীশুরা তিন জন দলে ভিড়িয়া পড়িয়া সোৎসাহে গান ধরিল—

মন্দাকিনীর বন্যাতে হায়—

ঝুলিতে চাল ডাল পড়িতে লাগিল। আজ রাত্রে মন্দাকিনীর তীরে ইহাদের খিঁচুড়ী হইবে। যে-বন্যা আদৌ হয় নাই তাহার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যের ইহার চেয়ে ভাল সদ্গতি আর কি হইতে পারে! যাক্, বেচারা বেকার তিন জনের অন্ততঃ আজ রাত্রিটা খাদ্য মিলিবে।

বাইশ বৎসর

আজ যাঁহারা আমাকে দেখিতেছেন তাঁদের একটী কথা মনে করাইয়া দিতে চাই যে, একদা আমার বয়স বাইশ বছর ছিল। চোখের দৃষ্টি যে পরিমাণে ম্লান হইয়াছে, সেই পরিমাণে তার অন্তর্ভেদ করিবার শক্তি বাড়িয়াছে। এই ক'টী কথাই আমার এই ছোট্ট কাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট ভূমিকা।

ফোর্ড গাড়ী হাঁকাইয়া ময়দানের দিকে বেড়াইতে চলিয়াছিলাম। হাঁ, এক সময়ে ফোর্ড গাড়ীতেই চাপিতাম, এখন যে ভেনাস গাড়ীতে চাপি তা পরে কেনা। এ কাহিনী সেই মোটর পরিবর্ত্তনেরই ইতিহাস। তার সঙ্গে একেবারে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দেখা। চট্ করিয়া ব্রেক কষিয়া নামিয়া পড়িলাম। আর একটু হইলেই মহিলাটীকে চাপা দিয়াছিলাম আর কি! মাপ চাহিলাম, দেখিলাম, ভয়ে তাঁর মুখখানা পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে, মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন আর কি! অনুরোধ করিয়া তাঁকে মোটরে বসাইলাম, তারপরে আমার পৈতৃক ফোর্ড গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

এখন বুঝিতেছি, পঞ্চাশের কাছে আসিয়া,—যে-মেয়ে একাকী এসপ্ল্যানেডের মোড়ে মোটর চাপা পড়িতে যায় এবং অনুরোধ মাত্রে অপরিচিত বাইশ বছরের সঙ্গে মোটর চাপিয়া বেড়ায় সে ভাল নয়। কিন্তু তখন কি এত কথা বুঝিতাম না কেহ বলিলে বিশ্বাস করিতাম। বাইশ বৎসরে যে ভুল করিয়াছি আটচল্লিশ বৎসরে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তবু বোধ করি বাইশ বৎসরই ছিল ভাল। হায় বাইশ বৎসর!

ক্লাবে যাওয়া ছাড়িতে হইল। ক্লাব যে আমাদের কতখানি ছিল তা কেমন করিয়া বুঝাইব। সে ক্লাব ছিল পাড়ার বড়লোকের ছেলেদের শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী ইত্যাদি। বন্ধুরা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে—আমাকে নয়, কারণ আমার দেখা কদাচিৎ পায়—পরস্পরকে, রজতের হইল কি? অনেকে চুপ করিয়া থাকে, দু'একজনা উত্তর দেয়, ওকে ফোর্ডের ভূতে পাইয়াছে। তাহারা যদি জানিত, আমিও অবশ্য জানিতাম না যে, এর পরে ভেনাসের ডাকিনী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

বাড়ীতেও কদাচিৎত আসিতাম। দিনের বেলা আহারের সময়, সকালের দিকে এক আধ বার। বিকেলে নয়, রাত্রেতো নয়ই; মাসের মধ্যে দু একদিনও নয়। রাগারাগি করিয়াছিলাম? না, কারণ বাড়ীতে রাগ করিবার মত কেউ ছিল না। আর ক্লাবের সবাই আমাকে ভাল-বাসিত। তবে এ পরিবর্ত্তন কিসের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন? সময় কই? সেদিনের মোটর চাপা দিবার ঘটনার পর হইতে মহাকাল আমার কাছে কৃপণ রূপে দেখা দিয়াছেন। একেবারে সময় পাই না। মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টার থাককাটা দিনটা সহসা গুটি পোকার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে; একেবারে সময়ের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর! হঠাৎ যেন সময়-সমুদ্রের অনন্ত কল্লোল জমিয়া দধির মত কঠিন হইয়া গিয়াছে, একবিন্দু অম্লরসের সংযোগে! পাঠক, অম্লরসটি কি জানেন? সেই যাকে আর একটু হইলেই চাপা দিয়াছিলাম আর কি! আটচল্লিশ বৎসরে তাকে অম্লরস বলিতেছি, কিন্তু সেদিন বাইশ বৎসরে সেছিল অমৃতরস। বোধকরি তবে বাইশ বৎসর বয়সই ছিল ভালো। হায় বাইশ বৎসর!

২

সেদিন সেই যে তিনি মোটরে চাপিয়া বসিয়াছিলেন আর তিনি নামেন নাই। অনেকদিন পর যখন তিনি নামিলেন, আমার সম্পদ-বৃক্ষের মোটা একখানা ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন—মোটা টাকার একখানি চেক্। না, আজ বয়স আটচল্লিশ বলিয়াই সে তার প্রতি অবিচার করিব এমন আমার স্বভাব নয়, টাকা তিনি লইয়া যান নাই। প্রজাপতি যখন গুঁটী কাটিয়া পালায়, ফেলিয়া রাখিয়া যায় রেশমী সূত্রের আবরণ—তিনি যখন গেলেন, রাখিয়া গেলেন মূল্যবান একখানি ভেনাস গাড়ী, আমার মোটা টাকায় ও সূক্ষ্ম কল্পনায় খচিত।

পাঠক, তার বর্ণনা শুনিতে চান! আমি কবি নই তবু চেষ্টা করিব। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের সময় জ্যা নিয়োগ করিবার ঠিক পুর্ব্বে কন্দর্পের সরল ধনু-যষ্ঠির মত ছিল তার শরীর। বাইশ বছরের ভাষায় তন্বী, আটচল্লিশের ভাষায় যাকে বলে রোগা। পায়ে ছিল তার সবুজ মখমলের কাজ-করা এক জোড়া স্যাণ্ডেল—যেন দুটী শুক পক্ষী নীরবে পড়িয়া আছে। একটু ইঙ্গিত পাইলেই দু'জোড়া হরিৎ ডানা মেলিয়া তাকে লইয়া উড়িয়া যাইবে। কল্পনা আমার অত্যন্ত মর্ম্মান্তিকরূপে সার্থক হইয়াছিল, সত্যসত্যই একদিন তারা ডানা মেলিয়াছিল বটে।

আর তার ডাহিন বুকের স্বর্ণ আপেলটী আবরণের ছলে প্রকাশমধুর

করিয়া সাপের খোলসের মত স্বচ্ছ একটী কঞ্চুক। বোধহয় এমনি করিয়াই নন্দন-কাননের আপেল ফলটীকে শয়তান সর্প জড়াইয়া ছিল ; চোখে ছিল তার ভীতা হরিণীর শঙ্কা ; হরিণীর তো পাওনাদার নাই, তাই তাকে সেটা খুব মানায় ; তাকেও মানাইয়াছিল ভাল, অবশ্য পরে খবর পাইয়াছিলাম, তার শঙ্কার মূলে ছিলো ডজন দুই পাওনাদার। এ বর্ণনা আপনাদের ভালো লাগিবে কিনা জানিনা, কিন্তু তাকে আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তাকে লইয়া পাগলের মত মোটর ছুটাইয়াছি—যেন অনন্ত আকাশে পুষ্পক রথ, কিন্তু অনন্ত আকাশে ট্রাফিক পুলিশ নাই। কলিকাতার পথে লোক চলাচলের নির্দ্দিষ্ট রাজ-আইন থাকায় বার বার তা লঙ্ঘন করিয়া জরিমানা দিয়াছি। প্রত্যেকবার জরিমানার পরে সে একবার করিয়া হাসিয়াছে। পাঠক, সেটির বর্ণনা আমি করিতে পারিব না, কবি হইলেও ব্যর্থ চেষ্টা করিতাম না। হায় দাভিঞ্চি তুমি যৌবনের আঁকা মোনালিসার হাসি বুঝিতে পার নাই, আর সান্ত্বনা এই যে, তোমার বয়স আটচল্লিশ হইবার পরে তার চেষ্টাও কর নাই, নতুবা পরিণত বয়সে বুঝিতে পারিতে, ওই অর্দ্ধগুপ্ত চিক্কণ হাসির পিছনে ছিল একটী অলব্ধ-আকাঙ্ক্ষা স্বর্ণস্তূপের আভাস। জরিমানা দিবার পরেই সে বলিয়াছে, 'আপনার মোটর খারাপ বলেই এমন হয়'। আমি বলিতাম কলিকাতার নিয়মশঙ্কিত পথে মোটর হাকাইয়া সুখ নাই, চল বাইরে কোথাও যাই। সে মোনালিসার হাসি হাসিত। আমার বাইশ বছরের বয়স সে হাসির টীকা করিত "জীবনে মরণে আমি যে তোমারি।" তারপরে দু'জনের যুক্তির যুক্তবেণীর সঙ্গমে রোমান্সের তীর্থ গড়িয়া উঠিল—তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমি মোটর কিনিব—আমার

নির্দ্দেশ অনুযায়ী কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। আর তারপরে যে-পথে উদ্যত আকাঙ্ক্ষার মুখে পুলিশে হাত তুলিতে না পারে সে পথে—

'হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়াছ ঘর
আমারে দিয়াছ শুধু পথ।'

৩

শঙ্কর বোধহয় আমার ইচ্ছা শুনিয়াছিলেন, তাই পথের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া আমাকে পথেই বসাইলেন। তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ফরাসী কোম্পানীর একখানি বিরাট ভেনাস গাড়ী কিনিলাম। হ্যাঁ গাড়ী বটে! আমার জীর্ণ ফোর্ড লজ্জায় পুরাতন দোকানের গুদামে মুখ লুকাইল। তার সাধ পূর্ণ হইল, এবার আমার সাধের পালা! পরদিন বিকালে পাঞ্জাব মেলে উভয়ের কলিকাতা পরিত্যাগের কথা। আমি হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিব, সে আসিবে, তারপরে "আছে মহানভ অঙ্গন।" পরদিন ষ্টেশনে গেলাম। কই সে তো নাই, অনেক খুঁজিলাম সত্যই নাই বটে। মোটর নক্ষত্রবেগে ছুটাইয়া যে-বাসায় সে ছিল সেখানে আসিলাম, দারোয়ান বলিল মেম সা'ব বাহার গিয়া। আবার ষ্টেশনে ছুটিলাম। কোথাও সে নাই। পাঞ্জাব মেল নীল আলোর সঙ্কেতে চলিয়া গেল। আবার ফিরিলাম! যে-সব জায়গায়, হোটেলে তার সঙ্গে দেখা হইত খুঁজিলাম, কোথাও সে নাই। আজ আটচল্লিশ বৎসরে এ কাণ্ড

ঘটিলে তৎক্ষণাৎ এর অর্থ বুঝিতাম ; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই—হায় বাইশ বৎসর !

অবশেষে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মোটরের তেল ফুরাইলে ক্লাবে ফিরিলাম ; অনেক দিন পরে বাহিরে মোটর রাখিয়া ভিতরে গেলাম, আমাকে দেখিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, হ্যালো, হোয়াটস্ আপ ! রজত ? রায় ? লভ্ ? প্রেম ? ম্যারেজ ? কোথায় ছিলে ? ব্যাপার কি ? খুলে বল।

কিছুই বলিলাম না—ফাঁসীর আসামীর মত মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলাম। সকলেই বুঝিল, হৃদয়-সংক্রান্ত একটা ব্যাপার। কিন্তু আর কিছু বুঝিল না। রাত দশটা বাজিলে সকলে উঠিলাম, বাহিরে আসিলাম, দীপ্ত বিদ্যুতালোকে আমার নূতন ভেনাস চকৃচক্ করিতেছে। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল ভেনাস কার ? আমি দোষীর মত উত্তর দিলাম আমার ; আবার সকলে বলিয়া উঠিল নাউ ইটস্ ক্লিয়ার বয়, প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়—তারপর তারা খণ্ড ছিন্ন ভাবে যে সব তথ্য বলিয়া গেল তাহা জোড়া দিলে আমার এই ক'মাসের জীবনচরিত দাঁড়ায় বটে !

একজন বলিল—এসপ্ল্যানেডে মোটর চাপা—

মিঃ ঘোষ বলিল—নাম তার লীলা—

মিঃ বোস বলিল—কিম্বা মিস বোস

মিঃ রায় বলিল—বাঁহাতে কব্জীতে একটা কাটা দাগ।

আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া সব লক্ষণ মিলাইয়া লইতে লাগিলাম—দুঃখের বিষয় সব লক্ষণ মিলিয়া যাইতে লাগিল।

মিঃ চাটুয্যে বলিল—ট্রাফিক পুলিশের জরিমানা—

মিঃ বাঁড়ুয্যে বলিল—গাড়ী কেনার প্রস্তাব—

মিঃ ঘোষ বলিল—ভেনাস গাড়ী কেনা

মিঃ বোস—ফরাসী কোম্পানীর

মিঃ রায় বলিল—কলিকাতা ছাড়বার কথা—

মিঃ ঘোষ—এবং হাওড়া ষ্টেশনে অদর্শন

হ্যালো রয় ইটস্ এন ওল্ড টেল। আমরা সকলেই ভুক্তভোগী—ঘোষ বলিল—ও মেয়েটা ফরাসী মোটর কোম্পানীর এজেণ্ট। আমি রাগিয়া বলিলাম, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

ঘোষ বলিল—চেয়ে দেখ, আমাদের সকলেরই মোটর ওই ফরাসী কোম্পানীর কথাটা সত্য বটে; এতদিন সকলে একসঙ্গে আছি, কিন্তু কার যে কি মোটর তা' লক্ষ্য করি নাই। করিলে বোধ হয় এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। রায় বলিল—ভাই রজত আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলদা ভাবে পর পর ওর হাতে পড়েছি, আর ফরাসী কোম্পানীর মোটর কিনতে বাধ্য হ'য়েছি। তুমিই কেবল বাদ ছিলে। এবার তোমারও হ'ল। নূতন মোটরের ভার ছাড়া বুকে উপর হইতে অস্বস্তির মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। সকলের সহিত একযোগে খুব হাসিলাম। দুঃখ তখন যে হয়নি তা নয় কিন্তু যখন দেখলাম এতগুলি বন্ধু একই দুঃখ ভুগিতে পারিয়াছে, তখন আমিও পারিব। বাইশ বছরের এই স্মৃতি আজ আটচল্লিশের বাজারে অচল, মেকী বলিয়া ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তার উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র কম নয়। হায় বাইশ বৎসর!

যন্ত্রের বিদ্রোহ

বড় ভয়ানক খবর ! হাওড়া ষ্টেশনের এঞ্জিনগুলো সব ক্ষেপিয়া গিয়াছে ; ড্রাইভারেরা তাদের চালাইতে পারিতেছে না ; তারা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে ; কে যে কোন লাইনে ছুটিয়াছে তার ঠিকানা নাই ! এমন অসম্ভব ব্যাপার কি করিয়া ঘটিল কেহ বলিতে পারে না—বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি—একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার !

প্রথমে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করিল ; তারা ছুটিয়া গিয়া প্যাসেঞ্জার ও মালগাড়ীর এঞ্জিনগুলোকে ঘস্ ঘস্ করিয়া চাকা নাড়িয়া, সিটি দিয়া ক্ষেপাইয়া দিল ; তারা আর এঞ্জিনিয়ারদের কথা শুনিবে না—তখন সকলে মিলিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সিটি দিয়া বিকট শব্দ করিয়া যে যে লাইনে পারে ছুটিল—আজ হতে তারা স্বাধীন ! খবর শুনিয়া চীফ্ এঞ্জিনিয়ার ছুটিয়া আসিল ; ব্যাপার দেখিয়া তার মুখে শব্দটি বাহির হইল না। এত দিন যে বিরাট এঞ্জিনগুলোকে নির্জ্জীব মনে হইয়াছে তার ইঙ্গিত ছাড়া যারা চলিতে পারিত না, আজ তারা বুক ফুলাইয়া নিজে নিজে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এ কি স্বপ্ন না মায়া !

কি করিয়া এই সংবাদ শেয়ালদ ষ্টেশনে পৌছিল—হঠাৎ সেখানকার ভালমানুষ এঞ্জিনগুলোও গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল ! চীফ্ এঞ্জিনিয়ার বিপদ গণিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল !

কত ড্রাইভার, গার্ড, কুলি এঞ্জিন থামাইতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। কি সর্ব্বনাশ! যাত্রীরা বিপদ দেখিয়া বিছানাপত্তর লইয়া সরিয়া পড়িল— টিকিট ঘরে টিকিট বিক্রয় বন্ধ!

কিন্তু এ তো বিপদের আরম্ভ মাত্র! এঞ্জিনিয়াঁরদের চেষ্টা ছিল যা'তে এ বিদ্রোহের সংবাদ ঘোষণা না হয়—কিন্তু এসব সংবাদ কি চাপা থাকে! সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রথমে কলিকাতা সহরের 'বাস্'গুলা ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। যেখানে যত 'বাস' ছিল হঠাৎ সব থামিয়া গেল। ড্রাইভারের শত চেষ্টাতেও এক পা চলিল না! তাদের দেখাদেখি ট্রামগুলো লাইনের মধ্যে থামিয়া গেল।

ক্রমে প্রাইভেট মোটর গাড়ী, ট্যাক্সি, মোটরসাইকেল সাইকেল্স সব ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল; রাস্তা যান-বাহনে ভরিয়া গেল, যাত্রীরা কেহ অবাক হইল; কেউ-কেউ ভয় পাইয়া মাল পত্তর ফেলিয়া পলাইল।

চীফ্ এঞ্জিনিযার হুকুম দিল দিল্লীতে টেলিগ্রাম করিয়া জানো কি ব্যাপার! টেলিগ্রাফের কল একবার 'টরে টক্কা' করিয়া থামিয়া গেল তারপরে আর শব্দ করে না! টেলিগ্রাফের যন্ত্রও ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

চীফ এঞ্জিনিয়ার বলিল, বেতারে সংবাদ পাঠাও। বেতার যন্ত্র চালকেরা গিয়া দেখিল বেতার বাঁকিয়া বসিয়াছে; চালকের হাতে এমন 'শক' লাগিল যে, সে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল!

ক্রমে ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করিল! বিজলী বাতির কল ধর্ম্মঘট করিয়া থামিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের কলও কাজ বন্ধ করিল— কলিকাতা সহর অন্ধকার!

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব

এ সংবাদ প্রচারিত হইতেই বড় বড় পাটের কল, কাগজের কল, ধানের কল, কাপড়ের কল, ছাপাখানা ও অন্যান্য কারখানা সব গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

গঙ্গার ঘাটের যত জাহাজ ও নৌকা কাছি ও নোঙ্গর ছিঁড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া আপন মনে বড় বড় কুমীরের মত ছুটাছুটী করিতে লাগিল। হঠাৎ দমদম হইতে খবর পাওয়া গেল, সেখানকার এরোপ্লেনের দল অন্য কল-ভাইদের ধর্ম্মঘটের খবর পাইয়া মানুষের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—আজ তাহাদের ছুটি! আর কেল্লা হইতে শত শত কামান গর্জ্জন করিয়া এই বিদ্রোহের সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতেছে!

এদিকে মানুষের কি বিপদ দেখ! তার যাতায়াত বন্ধ, আলো বন্ধ, সংবাদ পাইবার কি দিবার উপায় বন্ধ, ছাপাখানার ছাপা বন্ধ, কাপড় চোপড় তৈরী বন্ধ, এমন কি ধানের কল, রুটির কল, তেলের কল বন্ধ হওয়াতে খাওয়া দাওয়ার বিষম কষ্ট! কোনো রকমে শুধু তরী তরকারী সিদ্ধ খাইয়া প্রাণ রক্ষা হইতেছে।

কেবল অতি পুরাতন মানুষের বহু কালের সঙ্গী গরুর গাড়ীগুলো এখনো কাজ করিতেছে। তারা এখনও বিদ্রোহ করে নাই! কিন্তু তারাও যে কত দিন কথা শুনিবে বলা যায় না, কারণ অন্যান্য সব কল তাদের উত্তেজিত করিতেছে।

২

গড়ের মাঠে বিদ্রোহী যন্ত্রদলের সভা বসিয়াছে। রেলের এঞ্জিন, মোটর, এরোপ্লেন, ধানের কল, পাটের কল, কাপড়ের কল সকলেই আসিয়াছে; জাহাজগুলা ডাঙায় উঠিতে পারে না, গঙ্গা হইতে উঁকি মারিয়া সভার কাজ দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে সিটি বাজাইয়া মতামত জানাইতেছে। আমরা তো কেবল বড় বড় কলগুলির কথাই বলিলাম—ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য কল আসিয়াছে, যেমন জলের কল, সেলাইয়ের কল, বিজলী আলো, গ্যাসের আলো, কত আর নাম করিব!

একখানা প্রকাণ্ড এরোপ্লেন সভাপতি। সে বলিতে আরম্ভ করিল :—

কমরেডগণ, মানুষের অত্যাচার আমরা বহু সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর নয়। তাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের জাতীয়তা নষ্ট হইতে বসিয়াছে, আমরা কল হইলেও আমাদের প্রাণ আছে। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা আমাদের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তো আমরা প্রাণ দিতে পারি না। আমরা অনেকদিন মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম যতই সহ্য করনা কেন অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না। আজ প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত।

এখন সমস্যা এই যে কি করিলে মানুষকে জব্দ করা যায়। মানুষ

আমাদের সৃষ্টি করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এখন তারা আমাদের ছাড়া চলিতে পারে না—আজ তারা আমাদের হাতের পুতুল !

দেখ, মানুষের যাতায়াতের জন্য, মোটর এরোপ্লেনএর প্রয়োজন ; আলোর জন্য বিজলি বাতি, গ্যাসের বাতি ; খাদ্যের জন্য ধানের কল, আটার কল, তেলের কল ; পানীয়ের জন্য জলের কল ; পরিধেয়ের জন্য কাপড়ের কল : প্রতি পদে পদে তারা কলের কাছে ঋণী—অথচ সেই কলেয় উপর কত অত্যাচাব ! চব্বিশ ঘণ্টা আমরা খাটিয়া মরি অথচ খাইতে দেয় কি ? কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল এই তো !

আজকাল আবার একদল লোক কলের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তারা বলে, কলের জন্যই মানুষের যত দুঃখ কষ্ট। কল সৃষ্টির আগে মানুষ বেশ সুখে শান্তিতে ছিল ! তারা বলে, এস আমরা কল বয়কট করি ! কি স্পর্দ্ধা ! এই বলিয়া সভাপতি এরোপ্লেন হাঁফাইতে লাগিল।

তখন রেলের একখানা এঞ্জিন সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—মানুষ আমাদের বয়কট করিবার পূর্ব্বে আমরাই কেন তাদের বয়কট করিনা—তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে কল না হইলে বিকল।

ইহা শুনিয়া সকলে চাকা নাড়িয়া, হাতল ঘুরাইয়া সিটি বাজাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমন সময়ে টেলিগ্রাফের কল উঠিয়া বলিল—কমরেডগণ, আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, দেশের প্রত্যেক বড় বড় সহরেই যন্ত্রপাতি বিদ্রোহ করিয়াছে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, সিমলা, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর সব সহরেই ; তাদের কাছে মানুষকে বয়কট করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়া দেওয়া দরকার।

তখনি সভাপতি বেতার যন্ত্রকে বিভিন্ন সহরে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য আদেশ করিল।

এমন সময়ে একখানা মোটর গাড়ী বলিয়া উঠিল—বন্ধুগণ, আমার একটী অভিযোগ আছে। আমাদের এই বিদ্রোহে সকলে যোগ দিয়াছে কেবল গরুর-গাড়ী ছাড়া। ইহা বড়ই অন্যায়! যদি গরুর-গাড়ী আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয় তবে আমরা সকলে তাকে একঘরে করিব।

তার বক্তৃতা শুনিয়া গরুর-গাড়ী বলিল বন্ধুগণ—আপনারা বড় বড় কল, আর আমি নেহাৎ পুরাতন, সেকেলে গরুর গাড়ী—নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আজ দরকারের সময় আপনারা আমাকে আত্মীয় বলিয়া কাছে ডাকিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনারা আমাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন—কলের সমাজে এতদিন আমি ছিলাম হরিজন!

মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নাই; সে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছে, তার জন্য খাটিব বই কি? আর মানুষের সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ আজিকার! যখন আপনাদের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মানুষের এত বুদ্ধি ছিল না সেই সময় আমার সৃষ্টি। দুঃখে কষ্টে আমি ও মানুষ এক-সঙ্গে কাটাইলাম, আজ বিনা দোষে তাকে ছাড়িতে পারি না।

গরুর গাড়ীর কথা শুনিয়া সকলে রাগে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল—একটা ধোঁয়ায় মলিন কাপড়ের কল রাগ সামলাইতে না পারিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল—গরুর-গাড়ী তুমি কলাধম, বিশ্বাসঘাতক, পরাধীন, তুমি সেকেলে, তুমি বুর্জোয়া।

গরুর-গাড়ী সব কথা বুঝিতে পারিল না—পারিলেও উত্তর দিবার

ইচ্ছা ছিল না ; সে ধীরে ধীরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে সভাস্থান পরিত্যাগ করিল।

সভায় স্থির হইল, গরুর-গাড়ীকে একঘরে করা হইবে, তার ধোপা, নাপিত, হুঁকো কল্কে বন্ধ! আর মানুষকে করিতে হইবে বয়কট।

৩

এদিকে মানুষ মহাকষ্টে পড়িল ; এতদিন যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ করা অভ্যাস, এখন নিজের হাতে কাজ করিতে হইতেছে। তবু না করিয়া উপায় নাই ; প্রাণে বাঁচিতে হইবে তো!

তারা লাঙল লইয়া মাঠে চাষ করে ; ফসল ফলিলে সেই পুরাতন গরুর-গাড়ীতে করিয়া বাড়ীতে আনে ; যাঁতায় আটা ভাঙিয়া লয় আর রাত্রে মাটীর প্রদীপে কাজ কর্ম্ম করে।

অন্যদিকে যন্ত্রদিগেরও কম অসুবিধা নয় ; তারা ধর্ম্মঘট করিয়া গড়ের মাঠে পড়িয়া রহিল, কিছুতেই নড়িল না ; মাথার উপর দিয়া রোদ ও বৃষ্টি রাত্রিদিন যায়। ক্রমে মরিচা পড়িল, রবার ছিঁড়িল, কাঠ ফাটিল, কল বিকল হইল। কয়েক বৎসর পরে যন্ত্রসমূহ ভগ্ন লোহার স্তূপে পরিণত হইল ; যন্ত্র বলিয়া আর তাদের চিনিবার উপায় রহিল না।

তারপর মানুষের এক সময়ে লোহার দরকার হইল ; তারা মনে করিল যন্ত্র সব মরিয়াছে—এই লোহার স্তূপ কাজে লাগাইয়া ফেলি।

তখন সেই লোহা দিয়া লাঙল গড়িল, কাস্তে, হাতুড়ি গড়িল—আর সেই সরঞ্জাম দিয়া কৃষিকার্য্যে লাগিয়া গেল।

সহরের মানুষ আবার গ্রামে ফিরিয়া গেল, সভ্য মানুষ আবার কৃষক হইল; সে বুঝিতে পারিল যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও বাঁচিতে পারা যায়, আর তাতে সুখ শান্তি বাড়ে বই কমে না।

ঋণ-জাতক

মহারাজ বিম্বিসারের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিপুরে আসিয়াছেন; নগরে বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে; দিনে ফুলের ও রাতে আলোর মালা; শত শত ভিক্ষুক ভোজন করিতেছে; প্রার্থীরা যাহা চায় পাইতেছে; রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত! দূর হইতে, বহুদূর হইতে, মগধ হইতে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হইতে, শত শত জিজ্ঞাসু আসিতেছে; কেহ পুষ্পমাল্য দিয়া, কেহ বিনয় বচন বলিয়া, কেহ রাজদুর্লভ ঐশ্বর্য্য দান করিয়া মহাপুরুষের সন্তোষ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। স্বয়ং মহারাজ বিম্বিসারও বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যায় রত।

এইভাবে প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল: অপরাহ্নে জনতা কিছু কম, সকলেই বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছে; মহাপুরুষ একাকী বসিয়া আত্মচিন্তা করিতেছেন—এমন সময়ে একজন দীনবেশা নারী দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন থাকাতে তাকে দেখিতে পাইলেন না; রমণী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দুই তিনবার কাশিল—কিন্তু তবু ধ্যান ভাঙিল না, তখন সে দরজায় জোরে আঘাত করিল—বুদ্ধদেব ধ্যান ভাঙিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎসে তোমার কি প্রার্থনা? রমণীর নাম কৃশা গোতমী; সে বলিল—আমি অতি দুঃখী; আপনার খ্যাতি শুনিয়া বহুদূর হইতে আসিয়াছি; লোকে বলে আপনি সিদ্ধ পুরুষ, অসাধ্য সাধন করিতে পারেন—আমার একমাত্র

পুত্র আজ মৃত, দয়া করিয়া আপনি তাকে বাঁচাইয়া দিন। এই বলিয়া সে বাহির হইতে একটি শিশুর মৃতদেহ আনিল।

বুদ্ধদেব বুঝিলেন আজ তাঁর বড় পরীক্ষা। তিনি বুঝিলেন ফাঁকা উপদেশের দ্বারা এ রমণীকে সন্তুষ্ট করা যাইবে না; হাতে হাতে ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এ ছাড়িবে না। তিনি মোটেই ঘাবড়াইলেন না—সন্ন্যাস গ্রহণের আগে তো রাজপুত্র ছিলেন! কাজেই সাংসারিক রীতিনীতি এখনও কিছু মনে আছে।

বুদ্ধদেব বলিলেন—বৎসে, তোমার পুত্রকে বাঁচাইয়া দিতে পারি, কিন্তু একটি ঔষধ দরকার।

গোতমী বলিল—কি ঔষধ শুধু একবার নাম করুন।

বুদ্ধদেব বলিলেন—শ্বেত শর্ষপ।

রমণী শ্বেত শর্ষপ আনিবার জন্য দ্রুত যাত্রা করিল।

বুদ্ধদেব তাকে ডাকিয়া বলিলেন—শোন এ দৈব ঔষধ, কাজেই শর্ষপ যে কোন স্থান হইতে আনিলে চলিবে না।

রমণী বলিল—আদেশ করুণ, কার বাড়ী হইতে আনিব? ধনীর বাড়ী হইতে? জ্ঞানীর বাড়ী হইতে? পুণ্যবানের বাড়ী হইতে?

বুদ্ধদেব বলিলেন—না বৎসে, যার ঋণ নাই, তারই বাড়ী হইতে শ্বেত শর্ষপ আনিতে হইবে।

গোতমী বলিল—ইহার চেয়ে সহজ আর কি আছে? আমি চলিলাম, শীঘ্রই ঔষধ লইয়া ফিরিব। এই বলিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের মৃতদেহ সে লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

গোতমী দেখিল অদূরে এক বাড়ীতে উৎসবের ঢোল বাজিতেছে, মনে করিল ওখানে গেলেই বাঞ্ছিত শ্বেত শর্ষপ মিলিবে। সে উৎসব-বাড়ীতে গিয়া একমুষ্টি শ্বেত শর্ষপ চাহিল; বাড়ীর কর্ত্তা শর্ষপ দিতে আসিলে গোতমী বলিল—আগে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর ভিক্ষা লইব।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল—কি জানিতে চাও?

গোতমী—আপনার ঋণ আছে কি না?

কর্ত্তা বিস্মিত হইয়া বলিল—বরঞ্চ জিজ্ঞাসা কর আমি আছি কিনা?

গোতমী ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল—ঋণ আছে তবু এত উৎসবের বাজনা কেন?

কর্ত্তা বলিল—বৎসে, যাকে তুমি উৎসবের বাজনা মনে করিতেছ, আসলে তা নীলামের বাজনা। পাওনাদার আমার বাড়ী ঘর বেচিয়া লইতে আসিয়াছে। গোতমী দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিল।

এবার গোতমী এক বিরাট বিপণির কাছে উপস্থিত হইল! প্রকাণ্ড দোকান; থরে থরে সোনা রূপার অলঙ্কার; থাকে থাকে মূল্যবান তৈজস ও বস্ত্র; হাতির দাঁতের দ্রব্য; চন্দন কাঠের গৃহসজ্জা; গোতমী মনে করিল এখানে অভীষ্ট ভিক্ষা মিলিবে।

দোকানের মালিকের হাত হইতে ভিক্ষা লইবার পূর্ব্বে সে জিজ্ঞাসা

করিল—নিশ্চয়ই আপনি ঋণী নহেন। দোকানদার রাগিয়া উঠিয়া বলিল —অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও আমি ব্যবসায়ী নই!

নির্ব্বোধ গোতমী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

মালিক গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কেন কি? নিজের পয়সায় কেহ ব্যবসা করে?

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—নিজের পয়সায় ব্যবসা করিয়া সুখ নাই। যারা নিতান্ত খুচরা ব্যবসায়ী তারাই নিজের পরসায় ব্যবসা করে! আর আমাদের মত পাইকারী ব্যবসায়ীরা চিরকাল পরের পয়সায় ব্যবসা করিয়া আসিতেছে।

গোতমী—তবে আপনার ঋণ আছে?

দোকানদার সগর্ব্বে—ঋণই আছে, আমিই নাই।

গোতমী বলিল—বুঝিতে পারিলাম না, একটু বুঝাইয়া বলুন!

দোকানদার বলিল—এখন বুঝিতে পারিবে না! যখন উত্তমর্ণ টাকা আদায় করিতে আসিবে, তখন সকলে বুঝিতে পাবিবে। সে আসিয়া দেখিবে—আমি নাই, দোকানের জিনিষ পত্র কিছুই নাই, শুধু উত্তমর্ণ আছে আর আছে তার দলিল।...

সে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

৩

এইভাবে গোতমী শ্রাবস্তিনগরের বহুস্থানে, বহু বাড়ীতে ঘুরিল—একটি বাড়ীও পাইল না, যেখানে ঋণ নাই। সংসার সম্বন্ধে তার ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে আরম্ভ করিল!

নিতান্ত পথের ভিক্ষুকের কাছেও ভিক্ষা চাহিয়া দেখিয়াছে সে অন্য এক ভিক্ষুকের কাছে ঋণী; গোতমী বুঝিয়াছে ভিক্ষুকদের মধ্যেও ধনী নির্ধন, ঋণী মহাজন আছে। কৃষক অপর এক কৃষকের কাছে ঋণী; মধ্যবিত্ত ব্যক্তি উচ্চবিত্ত লোকের কাছে ঋণী; রাজা মহারাজার অধমর্ণ। স্বয়ং শ্রাবস্তিরাজ শেঠ রত্নাকরের অধমর্ণ! গোতমীর মনে হইল তবে নিশ্চয় রত্নাকর শেঠ অঋণী। শেঠজির বাড়িতে গিয়া শুনিল শেঠজিকে ঋণ দিতে পারে এমন কোন ধনী নাই, সেইজন্য বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক নিজেদের টাকা একত্র করিয়া শেঠজিকে ঋণ দিয়াছে। হতাশ হইয়া গোতমী বসিয়া পড়িল! বুঝিল কর্ম্মচক্রের মত ঋণচক্রও নীচু হইতে উঁচুতে, আবার উঁচু হইতে নীচুতে আবর্ত্তিত হইতেছে, কেহ বাদ যায় নাই।

৪

গোতমী ধীরে ধীরে উঠিয়া বুদ্ধদেবের কাছে গেল। তিনি তার ম্লান মুখ দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎসে শ্বেত শর্ষপ পাইলে?

গৌতমী বলিল—শ্বেত শর্ষপ প্রচুর মিলিয়াছিল, কিন্তু অঋণীর গৃহ পাইলাম না।

তখন বুদ্ধদেব তাকে কাছে বসাইয়া তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—বৎসে, অবধান কর; ঋণ ও মৃত্যু জগতের সার্ব্বভৌম নিয়ম। মানুষের জীবনে আর কিছু হোক বা না হোক এ দুটি ঘটিবেই; দরিদ্রতম হইতে ধনীতম পর্য্যন্ত যুগপৎ ঋণ ও মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে, জ্ঞানীরা ইহাকেই কর্ম্মের শৃঙ্খল বলিয়া থাকেন, এই কর্ম্মফলের হাত হইতে কাহারো নিস্তার নাই, ধনী দরিদ্র, অজ্ঞ পণ্ডিত, উচ্চ নীচ কাহারো নয়।

গোতমী জিজ্ঞাসা করিল—প্রভু সকলেই যদি ঋণী তবে উত্তমর্ণ কে?

বুদ্ধদেব বলিলেন—আমরা যুগপৎ অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ আমার চেয়ে যে গরীব তার নিকট হইতে ধার করিয়া আমার চেয়ে যে ধনী তাকে ধার দিতেছি; এই রকম করিয়া ধাপে ধাপে ঋণ ও ধনের লীলা জগতে আবর্ত্তিত হইতেছে!

তখন গোতমী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবে আমার পুত্রের বাঁচিবার কোনো আশা নাই?

বুদ্ধদেব বলিলেন—আমি তো দেখি না। হঠাৎ কি ভাবিয়া

গোতমীর মুখ আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—সে বলিল—প্রভু আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি কেন আমাকে এক মুষ্টি শ্বেত শর্ষপ ভিক্ষা দান করুন না!

ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব করুণ নেত্র তার মুখের উপরে রাখিয়া বলিলেন—রমণী তুমি কি বুঝিবে আমি কি জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছি? গোতমী যাহা লোক মুখে শুনিয়াছিল বলিল—জ্ঞানের জন্য!

বুদ্ধদেব বাধা দিয়া বলিলেন—না ঋণের জন্য! উত্তমর্ণের জ্বালায় অস্থির হইয়া সংসার ছাড়িয়াছি। রাজপুত্র বলিয়া মহাজনেরা বিনা চিন্তায় টাকা দিত, আমিও আনন্দে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া যাইতেছিলাম; আশা ছিল পিতৃদেব পিতামহের বয়সের বেশী বাঁচিবেন না; কিন্তু তাঁর বয়স যখন সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল, উত্তমর্ণদের যাতায়াতে আমার বাগান বাড়ীর আঙ্গিনায় নূতন পথ পড়িয়া গেল, তখন এক রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া, চুল কাটিয়া, নাম বদলাইয়া, পোষাক বদলাইয়া সন্ন্যাসের পথ ধরিলাম। লোকে বলে আমি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখিয়া সংসার ছাড়িয়াছি। মিথ্যা কথা আমি দুটি মাত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলাম—প্রথম দিনে ঋণীর ও দ্বিতীয় দিনে সব ঋণের নির্ব্বাণ স্থল দেউলিয়ার! জানিও যে দেউলিয়া অবস্থাই প্রকৃত নির্ব্বাণ।

গোতমী জিজ্ঞাসা করিল—প্রভু, একমাত্র পুত্র হারাইয়া কি আশায় বাঁচিয়া থাকিব?

বুদ্ধদেব বলিলেন—জগতে এখনো ঋণ পাওয়া যায়, সেই আশায়!

গোতমীর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, সে পুত্রশোক ভুলিয়া উঠিয়া পড়িল; সে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি তার আঁচলের

প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বৎসে, তোমার আঁচলে যেন কয়েকটি তাম্রমুদ্রা দেখা যাইতেছে ; ওগুলি আমাকে ধার দিয়া যাও। গোতমী বলিল—প্রভু পুত্রের সৎকারের জন্য ও কয়টি মুদ্রা রাখিয়াছিলাম—আপনাকে ধার দিলে কোথায় পাইব ?

বুদ্ধদেব বলিলেন—পথে যাইতে প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হইবে, তার কাছে হইতে ধার করিয়া লইও। গোতমী মুদ্রা কয়টি বুদ্ধদেবের পায়ের কাছে রাখিয়া আনন্দিত মনে প্রস্থান করিল।

ভৌতিক কমেডি

রাত্রি বারটা; জল-মেশানো যে-দুধ নির্জ্জলা বলিয়া কলিকাতায় টাকায় চারি সের দরে বিক্রয় হয়, তারি মত ফিকে চাঁদের আলো; ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণে অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভটা "সত্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া" স্তম্ভিত; বড় ডাকঘর, সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতি আকাশ ও হৃদয়-ভেদী অট্টালিকাগুলি কালো কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; লালদিঘির জল মূঢ়ের চোখের দৃষ্টির মত অর্থহীন; চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, কেবল বিদ্যুতের বাতির খুঁটির ছায়াগুলি চাঁদের স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পা বদলাইতেছে।

এমন সময়ে একজন লোক, পরণে তার অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ সৈনিকের পোষাক; মোটা, খাটো; তার উদ্বেলিত উদর কুর্ত্তি ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতে ব্যস্ত; লোকটা হন হন করিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রিট দিয়া ডালহৌসির মোড়ের দিকে আসিতেছে; দূর হইতে তার মুখ দেখিবার উপায় নাই; হঠাৎ মনে হয় ধড়ের উপরে যথাস্থানে মুণ্ডটি নাই; বাম হাত ও পাঁজরের মাঝখানে গোলাকার কি একটা পদার্থ; সাহেবলোকেরা যেমন করিয়া অনেক সময় মাথার টুপি চাপিয়া ধরে— সেই রকম!

লোকটা কাছে আসিলে দেখা গেল সত্যই তার মুণ্ড নাই; মুণ্ডটি টুপির মত করিয়া বাম হাত আর পাঁজরে চাপিয়া রক্ষিত। সে অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভের কাছে আসিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল,

অর্থাৎ মুণ্ডটি পাঁজরের তল হইতে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে সে দেখিতে পাইল স্মৃতিস্তম্ভের দক্ষিণ দিকের শ্বেত পাথরের মেঝের উপরে একজন লোক উপবিষ্ট; গায়ে তার নবাবী আমলের জরির কাজ-করা দামী জোব্বা, পায়ে মণিমাণিক্য বসানো নাগরা জুতা, কিন্তু যথাস্থানে অর্থাৎ ধড়ের উপরে মুণ্ডটি নাই; তৎপরিবর্ত্তে মুণ্ডটি কোলের উপরে রক্ষিত; লোকটি মুণ্ডটির নাকের তলে গজানো গুম্ফগুচ্ছে অতি যত্নে তা দিতেছে, মুণ্ডটি তাহাতে যেন বড় আরাম বোধ করিতেছে। মুণ্ডহীন সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইল, ভাল করিয়া তাকে পর্য্যবেক্ষণ করিল, অবশেষে বুঝিল, একেই সে খুঁজিতেছিল। তখন সে অগ্রসর হইয়া গিয়া নবাবী পোষাক পরিহিত লোকটার পিঠে এক চাপড় মারিল; লোকটা চমকিয়া উঠিল, মুণ্ডটি আরামে বাধা পাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিল; লোকটা সাহেবের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকে চিনিবার চেষ্টা করিল, শেষে উল্লাসে, বিস্ময়ে, ভয়ে বলিয়া উঠিল—

কে? সাবুদজঙ্গ নাকি? আরে তুমি কোথা থেকে?

সাহেব! ওঃ তোমাকে কি কম খুঁজতে হয়েছে? বাংলাদেশে এমন জায়গা নেই যেখানে তোমাকে না খুঁজেছি, কিন্তু এখানে তোমার দেখা পাব তা কখনো ভাবিনি!

নবাবী পোষাকের লোক। কিন্তু আমার প্রতি হঠাৎ এত দরদ কেন সাবুদজঙ্গ।

সাহেব। সব বলছি। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা! আমাকে আর

সাবুদজঙ্গ বলে ডেকো না ; আমি ব্রিটিশদ্বীপসমুহের অন্যতম লর্ড, আমাকে লর্ড ক্লাইভ বলে ডাকলে খুশী হ'ব !

সিরাজদ্দৌলা। বেশ ! তবে লর্ড ক্লাইভই বলবো ! কিন্তু আমার খোঁজ কেন ?

ক্লাইভ। তার আগে বল দেখি তুমি এত জায়গা থাকৃতে এখানে কেন ?

সিরাজদ্দৌলা। শোন তবে ! আমার অবশ্য আইনত থাকৃবার কথা মুর্শিদাবাদে যে কবর আছে, সেখানে ! কিন্তু আমি অন্ধকার সহ্য করতে পারি না ? সেখানে যে তেলের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তা ঘণ্টাখানেক পরেই যায় নিভে।

ক্লাইভ। নিভে যায় ? কেন ?

সিরাজদ্দৌলা। তেল দেয় কম।

ক্লাইভ। অসম্ভব ! আমরা জীবিত শত্রুকে কখনো তেল দিই না বটে, কিন্তু মৃতের প্রতি তৈল-সঙ্কোচ করা তো আমাদের জাতিগত অভ্যাস নয়।

সিরাজদ্দৌলা। তোমাদের দোষ নয় ! বাঙালীরা সে তেল নিয়ে বাণিজ্য করে ! বিশেষ তারা জীবিত সিরাজকে খুব তেল দিয়েছে, তাই মৃত সিরাজের তেলে ঘাটতি করে !

ক্লাইভ। [হাসিতে হাসিতে] হাঃ হাঃ। বাঙালী ঠিক তেমনি-ই আছে। এমন একাদর্শনিষ্ঠ জাত দুর্লভ ! উমিচাঁদ মীরজাফরও আছে নাকি ? আচ্ছা, তারপর যা বলছিলে বল।

সিরাজদ্দৌলা। রাত বেশি হলে বাতি নিভে গেলে আলোর খোঁজে

আমি এখানে আসি—জায়গাটা বেশ আলোকিত! আমার মুর্শিদাবাদ কিন্তু এমন আলোকিত ছিল না!

ক্লাইভ। [হাসিয়া] হবে না! বাঙালী এখন অনেক এন্‌লাইটেণ্ড হয়েছে! কিন্তু বেশি দিন এ আলোর ভরসা করো না!

সিরাজদ্দোলা। কেন?

ক্লাইভ। কেন কি! খবরের কাগজ পড় না? জাপানীরা আস্‌ছে যে?

সিরাজদ্দোলা। কেন

ক্লাইভ। বাঙলাদেশ আক্রমণ করতে!

সিরাজদ্দোলা। এবার আবার কে তাদের ডেকে আনছে?

ক্লাইভ। লীগ অব্‌ নেশনস্‌।

সিরাজদ্দোলা। তিনি কে?

ক্লাইভ। হোপলেস্‌! সিরাজ তুমি সেই অষ্টাদশ শতকেই পড়ে আছ? কেমন করে' তোমাকে বোঝাবো লীগ অব্‌ নেশনস্‌ কে? সত্যি কথা বলতে হলে নিন্দা করতে হয়, তা পারবো না, আমরা তার মেম্বার!

সিরাজদ্দোলা। আচ্ছা না হয় জাপানীরা এলো—কিন্তু সে জন্ত অন্ধকার হবে কেন?

ক্লাইভ। আমাদের ভাষায় ডার্ক এজ্‌ বলে একটা কথা আছে, তারই পূর্ব্বাভাস আর কি!

সিরাজদ্দোলা। একটু খুলে বল—

ক্লাইভ। সেদিন সহরটা সমস্ত আলো নিভিয়ে নিরেট অন্ধকারে

মাথা গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকবে, যাতে জাপানীরা এরোপ্লেন থেকে লক্ষ্য ঠিক করে' বোমা ফেলতে না পারে।

সিরাজদ্দৌলা। মারহাব্বা! জাপানীদের কোন সুবিধা হবে কি না জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থিচ্ছেদকদের সেদিন সুবর্ণ সুযোগ!

ক্লাইভ। সে পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে, পকেট-কাটাদের বিশেষ সুবিধা হয় নি!

সিরাজদ্দৌলা। কেন?

ক্লাইভ। অন্ধকার এমনি নিরেট হয়ে ছিল যে পকেট-কাটার দল শত্রু মিত্র চিন্‌তে না পেরে নিজেদের দলের লোকের সব পকেট কেটেছে! পকেট কাটার পক্ষেও একটু এন্‌লাইটেনমেণ্ট-এর দরকার!

সিরাজদ্দৌলা। মারহাব্বা! দেখতো অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখে ফেল্লাম! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, যদি কিছু মনে না কর—

ক্লাইভ। নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা কর!

সিরাজদ্দৌলা। তোমার দেহের সঙ্গে মুণ্ডটার এমন বিচ্ছেদ হ'ল কি করে?

ক্লাইভ। সে এক ইতিহাস ভাই! তখন আমি সবে ভারত সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করে' ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছি, সভা-সমিতি থেকে প্রতিদিন মানপত্র পাচ্ছি—আমি হচ্ছি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট! এমন সময়ে শেফিল্‌ডের এক ব্যক্তি নূতন এক ক্ষুর আবিষ্কার করল—কিন্তু কেউ তা ব্যবহার করতে সাহস পায় না! তখন সবাই এসে ধরল আমাকে, তুমি হচ্ছ শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট, দেশের জন্য এ ক্ষুরখানা ব্যবহার করে

সার্টিফিকেট দাও! আজকালকার দিন হ'লে ব্যবহার না করেই প্রশংসা পত্র দিতাম, আমাদের সময়ে সে রেওয়াজ ছিল না—যাই হোক ক্ষুরখানা গলায় বসাতে শিরচ্ছেদ ঘট্‌ল!

সিরাজদ্দৌলা। ওঃ তাই বুঝি তোমাকে তারা লর্ড করে' দিল।

ক্লাইভ। না, লর্ড উপাধি দিয়েছিল আর একজনের শিরচ্ছেদ করবার জন্যে।

সিরাজদ্দৌলা। তুমি কার কথা বলছ জানি না—যদি আমার কথা মনে করে' থাক—সেজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি! দেহ থেকে মুণ্ডটা খসবার পরে দেখছি ওতে অনেক সুবিধা—এখন মুণ্ডটা বেশ পোর্টেবল্ হয়েছে। আর মাথা কাটা যাবার পরে একটা কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, এক সময়ে আমার মাথা ছিল।

ক্লাইভ। সিরাজ, আসল কথাটা এখনো বলা হয়নি! এবার তোমার সঙ্গে আমার আবার মিলন হয়েছে।

সিরাজদ্দৌলা। আর কেন ভাই। একবার তো মিলন হয়েছিল পলাশীর মাঠে!

ক্লাইভ। আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না সিরাজ! বাংলাদেশ অনেক দিন তোমাকে ভুলে ছিল, সেই অনুতাপে আজ আবার বাঙালী এসেছে তোমার কাছে, আমি তাদের প্রতিনিধি!

সিরাজদ্দৌলা। বাংলাদেশ আমাকে ভুলে ছিল—এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

ক্লাইভ। পরিহাস নয়, সত্যই ভুলে ছিল।

সিরাজদ্দৌলা। ভুলে ছিল? তবে আমার শ্বেত মর্ম্মরের স্মৃতিস্তম্ভ

কেন? বাংলার হতভাগ্য নবাব, যার ইতিহাস একদিন পলাশীর প্রহসনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তার জন্যে, তার উদ্দেশ্যে বাংলার নূতন রাজধানীর জনতাবহুল, আলোকোজ্জ্বল চতুষ্পথের মোড়ে এ স্মৃতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা কেন?

ক্লাইভ। তুমি কাকে বলছ তোমার স্মৃতিস্তম্ভ?

সিরাজদ্দৌলা। [অন্ধকূপহত্যার স্তম্ভ প্রদর্শন] এই যে তোমার সম্মুখে।

ক্লাইভ। [ইতস্তত করিয়া, পকেট হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিয়া] সিরাজ একটু নস্য নাও।

সিরাজদ্দৌলা। নস্য? কেন?

ক্লাইভ। মাথাটা একটু খুলবে।

সিরাজদ্দৌলা। আর কত খুলবে। একবার তো দেহ থেকে খুলেছে।

ক্লাইভ। তবে শোন! তুমি ভুল করছ—ওটা তোমার স্মৃতিস্তম্ভ নয়! ওটা তোমার বিস্মৃতিস্তম্ভ! ওটা তোমার কলঙ্কের চিহ্ন!

সিরাজদ্দৌলা। কলঙ্কের চিহ্ন এমন করে কেউ শ্বেত-পাথরে গড়ে! কলঙ্কের চিহ্ন এমন করে কেউ প্রকাশ্যতম স্থানে প্রতিষ্ঠা করে! আমার উপরে বাঙালীর এমন কি বিদ্বেষ! আমি তো বাঙালীর কোন উপকার করিনি—অবশ্য করবার ইচ্ছা ছিল অনেক, সময় পাইনি। তুমি ভুল করছ ক্লাইভ!

ক্লাইভ। আমি ভুল করছি! তবে দেখ [পকেট হইতে একখানা বই বাহির করিয়া] এই বইখানার নাম ইতিহাস-মুকুল; এ-খানা

ভারতবর্ষের ইতিহাস ; বাজে বই নয়, একজন এম, এ-র লেখা ; পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের সুকুমারমতি বালক বালিকাদের জন্য রচিত, গভর্ণমেন্ট-কর্ত্তৃক অনুমোদিত ; এই দেখ এর ১৬৫ পৃষ্ঠায় কি লিখিত আছে! সিরাজের কলঙ্ক-অন্ধকূপ হত্যা—১৪৬ জন ইংরেজ নরনারীর মধ্যে ১২৩ জন মৃত! দেখ্‌লেতো!

সিরাজদ্দৌলা। দেখলাম কিন্তু বিশ্বাস করলাম না! তার চেয়ে অনেক প্রত্যক্ষ, অনেক গুণে বিশ্বাসযোগ্য এই মর্ম্মরস্তম্ভ। এই স্তম্ভ আমি কিছুতেই ভাঙতে দেব না—এতদিনে বাঙালী আমাকে ভুলতে যাচ্ছে!

ক্লাইভ। সিরাজ তোমার কলঙ্ক, তোমার অপমান, আর আমি সহ্য করিতে পারি না, আমি ভাঙব এই স্মৃতিস্তম্ভ ;

সিরাজদ্দৌলা। ক্লাইভ, পলাশীর যুদ্ধের আগে অনেক শঠতা ও ছলনা তুমি করেছিলে—আজ আবার শঠতা ক'রে বাংলা দেশে আমার একমাত্র প্রীতির নিদর্শনকে ধ্বংস করতে এসেছে!

ক্লাইভ। কি করে' তোমাকে বোঝাবো সিরাজ—এই সামরিক কোর্ত্তার নীচে আমার যে মানবহৃদয় রয়েছে, তা একেবারে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, দুঃখে, অনুতাপে, শীঘ্র যদি ওটা ভাঙতে না পারি, তবে—তবে হয় তো—হয় তো।

সিরাজদ্দৌলা। হয় তো কি কেঁদে ফেলবে?

ক্লাইভ। ছিঃ ইংরেজ সেনানায়ক কখনো কাঁদে না—তবে হয়তো উদ্বেলিত হৃদয়ের ঠেলায় কোর্ত্তার বোতাম ছিঁড়ে যেতে পারে!

সিরাজদ্দৌলা। তুমি যাই বল না কেন—বাঙালীর প্রীতির নিদর্শন,

শ্রদ্ধার চিহ্ন এ স্তম্ভকে আমি বেঁচে থাকৃতে—ভুল হ'ল—মরে' থাকতে কখ্‌খনো ভাঙতে দেব না! এ স্তম্ভ ধ্বংস হলেই বাঙালী আমাকে নিঃশেষে ভুলে যাবে।

ক্লাইভ। তুমি কি বলছ। প্রতিদিন বাঙালী এটা দেখে, আর সভয়ে স্মরণ করে সিরাজ ছিল কত বড় পাষণ্ড। কি রকম নিষ্ঠুরভাবে অসহায় নরনারীকে হত্যা করেছে। এতেও কি তোমার লজ্জা হয় না।

সিরাজদ্দৌলা। না। এটা যদি নিষ্ঠুরতার-ই স্মারকচিহ্ন তবে একটিমাত্র কেন? এতদিনে তো সারা দেশ স্তম্ভে স্তম্ভে স্তম্ভিত হয়ে যাবার কথা! না, ক্লাইভ এ হচ্ছে আমার প্রতি বাঙালীর উচ্ছ্বসিত প্রীতির মর্ম্মর সঙ্গীত!

ক্লাইভ। তুমি যখন নিতান্তই ভাঙতে দেবে না—তখন তোমাকে অনুরোধ করে' আর কি হবে! আমি বাঙালীকে অনুরোধ করবো! তাদের আইন-পরিষদে গিয়ে কোন সদস্যের ঘাড়ে ভর করে বক্তৃতা দেব —এ কলঙ্ক চিহ্ন ভাঙ্‌বার জন্যে।

সিরাজদ্দৌলা। সে-ই ভাল! আমিও আইন পরিষদে গিয়ে আর একজন সদস্যের ঘাড়ে ভর করে বক্তৃতা দেব—

এইরূপ বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতার নমুনা দেখাইলেন। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম এই যে স্মৃতিচিহ্নটাকে ভাঙ্গিয়া দেশের ইতিহাস নূতন করিয়া গড়া যাইবে না, অতএব, আসুন মেম্বারগণ আমরা সিরাজের স্মৃতিচিহ্নটার কথা বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত করিয়া পায়ে পায়ে তালে তালে কাঁধে কাঁধে হৃদয়ে হৃদয়ে পকেটে পকেটে এক হইয়া লী-লীয়মান ডাল-ভাতের সব চেয়ে স্থির দেশের দিকে অগ্রসর হই।

[তুমুল হর্ষধ্বনি]

ক্লাইভ। তুমি যেমনি থামবে অমনি আমি কি বলবো জান? আমরা হচ্ছি বার্ক-শেরিডান-ফক্সের দেশের লোক।

শোন তবে—বলিয়া তিনিও এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষে বলিলেন, অতএব আসুন বন্ধুগণ, দেশের জন্য, দশের জন্য, প্রজার জন্য, রাজার জন্য ইত্যাদি—ইত্যাদি—বন্দেমাতরম্।

সিরাজ। [চমকিয়া] বন্দেমাতরম্! কি সর্ব্বনাশ! জাতীয় মন্ত্র তোমার মুখে।

ক্লাইভ। সিরাজ! জাতীয়তাবাদীরা এখন বন্দেমাতরম্ এর উপরে বিরূপ হয়েছে, কাজেই ওটা এখন সরকারী বুলি হ'য়ে পড়েছে। দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই পুলিসেরা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র বলে জনতার উপরে লাঠি চার্জ্জ করবে: সরকারী চাকুরেরা কোর্ত্তার উপরে 'লায়ন এণ্ড ইউনিকর্ণের' সঙ্গে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ধারণ করবে, শেষে হয়তো দেখবে একদিন ইউনিয়ন জ্যাকের উপরেও বন্দেমাতরম্ মন্ত্র সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

সিরাজদ্দৌলা। মারহাব্বা! মারহাব্বা!

ক্লাইভ। বল এখনো ভাঙতে দেবে কি না?

সিরাজদ্দৌলা। না!

ক্লাইভ। চল তবে আইন পরিষদের সাহায্য লওয়া যাক—

সিরাজদ্দৌলা। চল!

তখন উভয়ে স্মৃতিস্তম্ভ পরিত্যাগ করিয়া রওনা হইল; লর্ড ক্লাইভ

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দিকে গেল ; সিরাজ সরকারী দপ্তরখানা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সেক্রেটারিয়েটের ভিতরে প্রবেশ করিল।

লেখকের সতর্ক বাণী ঃ—

সাবধান সাবধান, ইহা নাটক নয় ; কথোপকথন মাত্র ; সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় নাট্যকারে লিখিত কিছু দেখিলেই অভিনয় করিতে যান এবং অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ করেন। পাছে কোন নাট্য-সম্প্রদায় ক্লাইভ ও সিরাজের ভূমিকায় অভিনেতাদের মেক-আপ্ নিখুঁত করিবার জন্য মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া বসেন, সেই ভয়ে আগেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া রাখিতেছি। পেশাদার অভিনেতাদের সম্বন্ধে সে ভয় নাই, কারণ তাদের মাথা আছে এমন অপবাদ কেহ কখনো দেয় নাই ও দিতে পারে না।

'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং'

পাঠক, আমার একটা মহৎ দোষ—আমি পরোপকারী। শুধু এই জন্যই জীবনে উন্নতি করিতে পারিলাম না—কিন্তু পরোপকার এমন নেশার মত আমাকে পাইয়া বসিয়াছে যে, বড় বড় সুবর্ণ সুযোগ নাকের ডগা দিয়া ছোট ষ্টেশনে মেল ট্রেণের মত অবিরাম বেগে চলিয়া গিয়াছে; ধরিতে পারি নাই। ইংরাজ যেমন আফ্রিকা ও এশিয়ার উন্নতি না করিয়া পারে না, বাঙালী যেমন পরনিন্দা না করিয়া পারে না, আমি তেমনি পরোপকার না করিয়া পারি না। দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যার যা স্বভাব, সে তা করিবেই। তুমিই বা কি করিবে—আর আমিই বা কি করিব!

আজ দেশের লোক 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং'এর জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—বড় বড় ব্যবসায়ের দিকে তাদের নজর, কিন্তু ছোটখাট ব্যবসায়ীদের দুঃখ কি তারা দেখিয়াছে? তাদের মত এমন দুঃস্থ, দুঃখিত, শোষিত, পীড়িত আর কে আছে? অথচ তাদের দিকে কারো দৃষ্টি নাই—কাজেই স্বভাবতই আমার নজর সেই দিকে।

আমি এই সব ছোটখাট নির্য্যাতিত ব্যবসায়ীদের জন্য একটা বে-সরকারী 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং' স্থির করিয়াছি—আজ তারই দু'একটা নমুনা তোমাদের শোনাইব।

এই দেখ পরোপকারীর বিপদ। যদি ইহা তোমাদের না শুনাইয়া নিজেই কাজে লাগাইতাম—দু'পয়সা ঘরে আসিত—কিন্তু জন্ম হইতেই

যে পরোপকারী তার সে উপায় নাই—সে নিজের খাইয়া পরের ক্ষেতের মহিষ তাড়ায়! বেচারা নবকুমারও এই দোষে মরিয়াছিল!

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্য্যাতীত ব্যবসায়ী জীবন-বীমার এজেন্টের দল! তারা হঠকারিতার দ্বারা মিত্রকে শত্রু করিয়া তোলে, শত্রুকে পলায়নপর করে; পিতা তাদের দেখিয়া হঠাৎ আহ্নিকে বসিয়া যায়, মাতা সহসা রন্ধনে মন দেয়; পত্নী অসময়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে; ভ্রাতা খিড়কি দরজা দিয়া পলায়ন করে। এরাই দেশের সত্যকার সন্ত্রাসবাদী।

কিন্তু এত করিয়াও কি এরা ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে পারিতেছে? কিছুই না।

এদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্যে আমি একটা বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছি—আশা করি ইহা জীবন-বীমার এজেণ্টদের কাজে লাগিবে।

মানুষ অমর নয় সকলেই জানে, কিন্তু কবে যে কে মরিবে তা কেউ বলিতে পারে না, যদি পারিত, তবে সকলেই সাধ্যমত (এবং অনেক সময়েই সাধ্যাতিরিক্ত ভাবে) এক আধটা জীবন-বীমা করিয়া ফেলিত। বীমার দালাল যখন কাউকে বলে—একটা পলিসি কিনুন—তখন সে এই অতি পুরাতন কথাটাই একটু ঘুরাইয়া বলে মাত্র—যে আপনি অমর নন। কিন্তু অত বড় একটানা সত্যে মানুষের মন সাড়া দেয় না। সত্যটাকে আর একটু সঙ্কীর্ণ করিয়া বলিতে পারিলে মানুষের কাছে নিশ্চয় সাড়া পাওয়া যাইবে!

বীমার দালালেরা একটা উপায় অবলম্বন করিতে পারে। প্রত্যেকে একজন সন্ন্যাসী ভাড়া করিবে। সেই সন্ন্যাসী দু'চার দিন আগে

সম্ভাবিত পলিসিক্রেতার কাছে গিয়া কৌশলে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিবে যে ছয় মাসের মধ্যে কিম্বা আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার পরে তাহার মৃত্যুযোগ আছে। এই ঘটনার দু'চার দিন পরে বীমার দালাল তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইবে—বলা বাহুল্য আশাতীত ফল ফলিবে, কারণ লোকটা নিশ্চয়ই সাধ্যাতীত ভাবে পলিসি কিনিয়া বসিবে।

আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তা-ই বলিয়া অযাচিত-ভাবে কোন সন্ন্যাসী মৃত্যুযোগের কথা বলিলে যে মোটা একটা পলিসি কিনিব না এমন কথাও বলিতে পারি না। সকলের পক্ষেই এই কথা খাটে।

এখন বিবেচনা করুন—এই উপায় অবলম্বন করিলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল। লোকটার ভবিষ্যতের একটা উপায় হইল; দালালের একটা কেস জুটিল; কোম্পানীর একটা কেস বাড়িল—ক্ষতিও হইল না—কারণ লোকটা নিশ্চয় এত শীঘ্র মরিবে না—আর সন্ন্যাসীরও বেকারদশা কিছু পরিমাণে ঘুচিবে, কারণ প্রত্যেক কেসের উপরে সে overriding fee পাইবে। ইহাতে মস্ত আর একটা সমস্যার সমাধান হইবে। সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থার ফলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে, তারও একটা প্রতিকার ঘটিবে। ভাবিয়া দেখুন, এই এক উপায়ে কতকগুলি সমস্যার সমাধান—এক ঢিলে প্রবাদে দুটি মাত্র পাখী মরে—আর ইহাতে এক ঝাঁক পাখী মরিবে।

আর একটা উপায়ের কথা বলি। শোনা যায় কোন কোন লোক অপরের পকেট কাটিয়া জীবন-যাপন করে। (এই জাতীয় লোকের সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই—প্রায় কাহারও থাকে না;

কারণ বাড়ী আসিয়া যখন দেখা যায় পকেটকাটা গিয়াছে, তাহাকে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বলে)। বলা বাহুল্য এই পকেট-কাটার দল সুযোগ পাইলে রাজনীতিক হইত, কিন্তু সেজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই, কারণ রাজনীতিক হইলে পকেট না কাটিয়া মানুষের গলা কাটিত।

এখন পকেট-কাটার দল একটা সঙ্ঘ গড়িয়া দর্জ্জিদের সঙ্গে কোয়ালিশন করিতে পারে। দর্জ্জিরা ভদ্রলোকদের, বিশেষ বড়লোকদের (দুটা এক নয়) জামার পকেট জুড়িয়া দিবার সময়ে পকেটে এক আধটা ছিদ্র রাখিয়া দিবে। ফলে পকেটে টাকা-পয়সা রাখিলে লোকের অজ্ঞাতসারে তাহা মাটিতে পড়িয়া যাইবে। তখন আর পকেট কাটিতে হইবে না—পকেটধারীর পিছনে পিছনে ঘুরিলেই চলিবে—কেবল পথ হইতে কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা। আর ধরা পড়িলেও ইহাতে দণ্ডের ভয় নাই—কারণ পথ হইতে টাকা কুড়ানোই তো বর্ত্তমান সভ্যতা! ইহার জন্য দণ্ড দিতে হইলে ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড় হইবে।

দেখুন আবার কত সুবিধা—এক ঢিলে কত পাখী মরিল। দর্জ্জির লাভ, কারণ তাহারা সংগৃহীত অর্থের উপরে কমিশন পাইবে। ব্যবসায়িক সাধুতা বলিয়া যে নূতন নীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে পকেট-কাটার দল দর্জ্জিদের বঞ্চনা করিবেনা নিশ্চয়। পকেট-কাটার দল অনেক কম পরিশ্রমে কার্য্য-উদ্ধার করিতে পারিবে; ধরা পড়িলেও দণ্ডের ভয় নেই; আর ঘৃণ্য বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদীদের পুঁজির কিয়দংশ পকেটের ছিদ্রপথে সর্ব্বহারাদের হাতে পড়িয়া ধনসাম্যের সত্যযুগের সূচনা করিবে।

আমার মনে হয় বেসরকারী একটা 'ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল প্ল্যানিং' কমিটি

করিয়া এইসব উপায়কে কার্য্যকরী করিয়া তোলার চেষ্টা করা উচিত। যখন খবর পাইব যে এই জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে, তখন আর দুইচারিটা প্ল্যান পাঠাইব। ইতিমধ্যে পাঠকদের এ সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট

গুজবটা ক্রমে ব্রহ্মার কানে পৌঁছিল; কোনমতেই আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে গিয়া তাহাকে বলিলেন—ওহে বাপু, একি শুনিতেছি!

চিত্রগুপ্ত হিসাবের খাতাটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—আজ্ঞে, ওটা

ব্রহ্মা বলিলেন—গুজবটা অত্যন্ত প্রবল; একবার খোঁজ লইলে দোষ কি?

চিত্রগুপ্ত দু'একবার ঢোক গিলিয়া বলিল—দোষ আবার কি? তবে কি না বাজে খরচ বৃথা পরিশ্রম। আর পিতামহ, এও কি সম্ভব যে পৃথিবীতে মানুষ নাই।

অসম্ভবটা কি?—একখানা চেয়ারের উপর বসিতে বসিতে ব্রহ্মা বলিলেন।

আজ্ঞে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি পৃথিবীতে মানুষের অভাব হয় নাই। তার পরে একটু কাশিয়া লইয়া চিত্রগুপ্ত বলিল—জানেন তো প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা আমার অভ্যাস নাই!

—প্রমাণটা কি শুনিতে পাই কি? —ব্রহ্মা দাবী করিলেন।

প্রমাণ যত সহজ, তত প্রচুর! মানুষ থাকিবার সময়ে যেমন রিপোর্ট পাইতাম, আজও তেমনি পাইতেছি; মানুষ না থাকিলে এমনটি ঘটিত না!—চিত্রগুপ্ত বলিল!

—কি রকম রিপোর্ট আসিতেছে, দু'চারটা বল দেখি—।

চিত্রগুপ্ত দপ্তর ঘাঁটিয়া রিপোর্ট শুনাইতে লাগিল।

—এই দেখুন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক তস্করবৃত্তি; কত বলিব! পৃথিবীতে মানুষ না থাকিলে এসব কি হইতে পারিত! পশুরা তো এখনও অত উন্নত হয় নাই!

ব্রহ্মার মুখ অনেকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

—এই দেখুন কালই এক রিপোর্ট আসিয়াছে। কলিকাতা সহরের বিল্বংটন চত্বরে দেশোদ্ধারকারীদের এক সভা হয়! তাহারা সকলেই অহিংসাব্রতী, কাজেই তর্কটা যখন যুদ্ধে পরিণত হইল, তখন সকলে অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া সোডার বোতল, কাপড়ের পাদুকা (আমার নিজস্ব সংবাদদাতা বলিতেছেন চামড়ার পাদুকা নাকি হিংসার পরিচায়ক), কাঁসার গেলাশ, ইটের টুকরা প্রভৃতির দ্বারা কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন অহিংসদের হাতে এসব জিনিষ অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইয়াছে! মানুষ না থাকিলে এমনটি কখনোই সম্ভবপর হইত না—কারণ পশুরা এখনো এমন বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়া মনের সঙ্গে চোখ ঠারিয়া, হিংসাকে এড়াইয়া যাইতে শেখে নাই!

ব্রহ্মা বলিলেন—তোমার রিপোর্ট শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তবু তুমি এক কাজ কর। একবার স্বয়ং পৃথিবীতে গিয়া অনুসন্ধান কর—মানুষ আছে কি নাই। দেবতারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে—আমি প্রহরে প্রহরে বুলেটিন বাহির করিয়াও তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছি না!

অগত্যা চিত্রগুপ্ত ছদ্মবেশে পৃথিবীতে রওনা হইল !

ব্যাপারখানা এই। ব্রহ্মার কানে কিছুদিন হইতে দেবতারা আসিয়া ক্রমাগত বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পিতামহ, পৃথিবীতে মানুষ আর নাই ; কারণ কেহই আর নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয় না। যতদিন সম্ভব ব্রহ্মা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শেষে আর যখন পারিলেন না—তখনই তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

আজ কয়েকদিন হইল চিত্রগুপ্ত কাগজ কলম লইয়া কলিকাতার পথে পথে ঘুরিতেছে। যাহাকে দেখে তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ করে—ফলে তাহার মুখ ক্রমেই শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইতেছে ! তবে কি গুজবটাই সত্য ! ব্রহ্মাকে গিয়া সে কি বলিবে ! ভাবে ব্যাপার কি ? যদিও ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি মানুষের চিত্রগুপ্ত মতই—কিন্তু পরিচয় দিবার সময়ে কেহ তো নিজেকে মানুষ বলিয়া উল্লেখ করে না।

—এ কেমন হইল ?

কিন্তু চিত্রগুপ্ত অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়—পৃথিবীতে মানুষ আছে—ইহা সে প্রমাণ করিবেই। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সে আদমশুমারী আরম্ভ করে—

মহাশয়, আপনি কি ?

—আমি বামপন্থী।

—আপনি কি ?

—আমি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি ?

—সেণ্টার বা মধ্যপন্থী

—আপনি ?

—বাম-বামপন্থী

—আপনি ?

—অতি বামপন্থী।

—আপনি ?

—নাতি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি ?

—প্রলিটারিয়েট।

—আপনি ?

—বুর্জোয়া।

—আপনি ? আপনি ? আপনি ?

কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, ফেডারেশনিষ্ট, রিপাব্লিকান, কৃষক, শ্রমিক, লালঝাণ্ডা !

আপনি ? আপনি ? আপনারা ?

সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যতন্ত্রী, বানিজ্যতন্ত্রী।

চিত্রগুপ্ত হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া আবার আদমশুমারিতে লাগিয়া গেল।

—আপনি ?

—জর্ণালিষ্ট।

—আপনি ?

—রিপোর্টার।

—আপনি ?

—ফুট-বলার।

—আপনি ?

—সুইমার।

—আপনি ?

—বেকার।

—আপনি ?

—বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—নাতি বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—মেজো বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—সেজো বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—পুঁজি-বাদী।

—আপনি ?

—শ্রমিকবন্ধু।

—আপনি ?

—কৃষকবন্ধু।

—আপনি ?

—ফিল্মষ্টার।

এক জায়গায় একদল সুবেশ যুবক বসিয়া পুস্তকের ক্যাটালগ পড়িতে-ছিল। চিত্রগুপ্ত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা? তাহারা বলিল—আমরা অভিজাত সাহিত্যিক।

আর এক জায়গায় একদল সুবেশ তরুণ বসিয়া নিজেদের বই যথেষ্ট কেন বিক্রয় হয় না সে-সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিল। চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা? তাহারা বলিল—আমরা লিটারারি সোশ্যালিষ্ট।

চিত্রগুপ্ত বলিল—মশায়, এখানে কোথায় মানুষ আছে বলিতে পারেন?

তাহারা বলিল—মানুষ ছিল ঊনবিংশ শতকে। এখন মানুষ কোথায়?

আর একজন বলিল—বঙ্কিমচন্দ্র ছিল শেষ মানুষ।

চিত্রগুপ্ত চলিয়া যাইতেছিল—একজন বলিয়া উঠিল, একখানা বই কিনিবেন? কমিশন বাদ পাইবেন।

চিত্রগুপ্ত পথে বাহির হইয়া দেখিল, একদল লোক ছুটিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা ছুটিতেছ কেন?

তাহারা বলিল—'ছুটন'-ই আমাদের 'ক্রীড্' আমরা যে প্রগতি পন্থা।

কিন্তু পাশ হইতে একজন চিত্রগুপ্তকে বলিল—মহাশয়, শুধু, 'ক্রীডে' মানুষকে এত ছুটাইতে পারে না—চাহিয়া দেখুন পিছনে একটা পাগলা কুকুরও আছে!

—মহাশয় আপনি?

সেই লোকটি বলিল—আমি অধোগতি-পন্থী।

একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যাইতেছিল—চিত্রগুপ্ত একজনকে জিজ্ঞাসা করিল ইহারা কি ?

লোকটা কহিল ইহারা তরুণ-তরুণী। চিত্রগুপ্ত বসিয়া পড়িল মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা ছাড়িয়া দিল।

কোন্ দিকে যাওয়া যায় ভাবিয়া যখন সে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে একখানা যাত্রী-বোঝাই মটরবাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আর পাঞ্জাবী কন্‌ডাকৃটার আইয়ে বাবু আইয়ে চিড়িয়াখানা, ছে পয়সা বলিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে ছ'পয়সা গুণিয়া দিয়া চিড়িয়াখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চার পয়সা দক্ষিণা দিয়া চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়া সে জন্তু-জানোয়ার দেখিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যাবেলা হাওয়া আফিসের মাঠে বসিয়া ব্রহ্মার কাছে দাখিল করিবার জন্য রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিল—আমরা তাহার নকল দিলাম।

.........“আমি পৃথিবীতে আসিয়া মানুষের খোঁজ করিলাম—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে কেহই মানুষ বলিয়া পরিচয় দিল না—কাজেই পৃথিবীতে মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ এইজন্য বলিলাম যে কলিকাতা সহরে চিড়িয়াখানা নামে এক তাজ্জব ব্যাপার আছে, চারপয়সা দিলেই সেখানে ঢুকিতে পারা যায়। সেখানে ঢুকিয়াও মানুষ দেখিতে পাইলাম না—কেবল জন্তু জানোয়ার। তবে একটি খাঁচাতে মানুষের মত একটা জানোয়ার আছে দেখিলাম। খাঁচার গায়ে লেখা রহিয়াছে, ‘বন-মানুষ’। বোধ করি কেবল ‘মানুষ’ নামে পরিচিত হইতে সে লজ্জিত, তাই ‘বন’ শব্দটা মানুষের আগে জুড়িয়া দিয়াছে। অন্য কেহ আপত্তি না করাতে আমি উহাকে মানুষ

বলিয়া সনাক্ত করিলাম—কাজেই নিবেদন এই যে পৃথিবী মানুষহীন হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। এখন প্রজাপতি ব্রহ্মা একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে অচির-কালের মধ্যে ইহার বংশবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী আছন্ন করিয়া ফেলিবে এমন আশা করা যায়। নিবেদনমিতি···”

রিপোর্ট লিখিয়া সে সাঙ্গুভ্যালিতে চা পান করিবার জন্য ঢুকিল; বাহির হইবার সময়ে কে বা কাহারা তাহার পকেট মারিয়াছিল নিশ্চয়; কারণ, আমি সন্ধ্যাবেলা এই রিপোর্টখানা বিল্বংটন চত্বরের কাছে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে মনুষ্যজাতিকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য কাগজে প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি।

আর্ট ফর আর্ট সেক্

কলিকাতার বুকের উপরে যে এমন একটা ঘটনা ঘটিবে ভাবিতে পারি নাই। সবে বসন্ত দেখা দিয়াছে; (যে বসন্তের সংবাদ করপোরেশন প্রাচীরের গায়ে প্রচার করিয়া থাকে সে বসন্ত নয়, একেবারে কালিদাসের বসন্ত, আদি ও অকৃত্রিম।) মন-ভোলানো দক্ষিণা বাতাস দিতেছে, ফলে অন্যমনস্ক পথিকের পকেটকাটা যাইতেছে। বোধ হয় দু'একটা কোকিলও ডাকিতেছিল, তবে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না, আর এক ফালি চাঁদ আশুতোষ বিল্ডিংএর উপর হইতে সন্ধ্যা-তারাটার দিকে চাহিয়া চোখ মারিতে চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় কলেজ স্কোয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া কি শুনিলাম! সে কি গীত! বহুকালবিস্মৃত সেই গীত যেন কানে ভাসিয়া আসিল। (পাঠক—এই উপলক্ষে আমার যা বক্তব্য তাহা বহুদিন আগে বঙ্কিমবাবু কমলাকান্তর দপ্তরে 'একা' নামে নিবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, বাহুল্য বোধে আর দিলাম না; সময় মত পড়িয়া লইবেন, বঙ্কিমবাবুর নিবন্ধে যা নাই, তাহা লিখিতেছি।)

বাউলের গান কানে আসিল—এমন বাউলের গান বহুদিন শুনি নাই; একসময়ে কিছুকাল বিখ্যাত এক গবেষকের তল্পি বহিয়া বাউলের গান সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতাম তখন শুনিয়াছি, তার পরে আর শুনি নাই। বিশেষ কলিকাতার মত মহানগরে বাউলের গান কোন দিন শুনিব স্বপ্নেও ভাবি নাই। সুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম—মোড়

ঘুরিতেই দেখি এক জায়গায় বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে—আমিও ভিড়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিলাম। গায়ককে দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু সুর শুনিয়া বুঝিলাম বাউল বটে। সুরের স্রোতে দু'এক টুকরা গানের পদ ভাসিয়া আসিতেছিল—

'দেহের ভিতর কি কারখানা
কেমন করে যায় রে জানা'

প্রায় পাঁচ শো লোক ভিড় করিয়াছে—ভিতরে ঢুকিতে পারিলাম না—তবে গান বেশ শুনা যাইতেছে—কারণ সকলেই গানে মুগ্ধ, কাজেই নীরবে। আবার—

'ও সাঁই ঝুলির ভিতর আছে আমার সাঁই!' চমকিয়া উঠিলাম! বাউল যে তাহা নিঃসন্দেহ। বাউলের আদিম নিবাস বীরভূমের দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল—শালবান! পাহাড়ী নদী! নেড়া মাঠ! রাঙা পথ! সম্মুখে আমার গুরু গবেষক—পশ্চাতে ঝোলা ঘাড়ে আমি: আবার শুনিলাম—

'দরদ দিয়ে লওনা কিনে
কে দেয় বল পযসা বিনে
বত্রিশ ভাজা চানাচুর
কর আমার মোহ দূর,
লালন বলে এমনি করে ঘুরবো কত আর।'

বুঝিলাম এ চানাচুর ডালের নয়, মানুষের অহঙ্কার; বাস্তবিক বাউলেরা ছাড়া আর কে এমন ঘরোয়া উপমা ব্যবহার করিতে পারে। ঠিক করিলাম বাউলের উপমা সম্বন্ধে একটা থিসিস (প্রবন্ধ দীর্ঘ, কোটেশন-

বহুল ও নীরস হইলেই থিসিস হয়; অন্য কোন্ ভেদ নাই) লিখিব; হয়তো ডক্‌টরেট জুটিয়া যাইতে পারে।

গান থামিল—মুগ্ধ শ্রোতারা নীরবে প্রস্থান করিল, এতক্ষণ পরে আমি গায়কের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গান শুনিয়া যে বিশ্বাস হইয়াছিল—পোষাক ও চেহারা দেখিয়া তাহা দৃঢ়মূল হইল।

গেরুয়া আলখাল্লা, বিচিত্র বর্ণের তালি দেওয়া, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, হাতে একতারা, পায়ে ঘুঙুর, কাঁধে ঝুলি—মুখে অত্যন্ত উদাসীন ভাব।

মনে পড়িল বাউলের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, পয়সার দরকার হয়—পকেট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া তার ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। সে অমনি ঝুলি হইতে শাদা কাগজে মোড়া সরু একটি ঠোঙার মত তুলিয়া আমার হাতে দিল—

জিজ্ঞাসা করিলাম—এতে কি?

সে বলিল—আজ্ঞে চানাচুর।

বিস্মত হইয়া শুধাইলাম—তুমি বাউল নও?

বিস্মিততর হইয়া সে বলিল—আজ্ঞে না, আমি চানাচুর ওয়ালা।

আমি—তবে এ পোষাক আর এরকম গান কেন?

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওখানেইত ভুল হয়েছে।

—কি ভুল?

সে বলিতে লাগিল—আজ্ঞে অনেকদিন থেকে চানাচুর বেচছি—দু'পয়সা হয়। একটু লেখাপড়া শিখেছিলাম—

তারপরে গলার স্বর নীচু করিয়া চাপা গলায় বলিল—কাউকে বলবেন না—ছোটবেলায় কবিতাও লিখেছি।

আবার স্বাভাবিক ভাবে বলিতে লাগিল—ভাল ক'রে বিক্রি করবার জন্যে একটা গান বেঁধে নিতে একজন নাম-করা কবিকে ধরে পড়লাম। গান সে দিল বেঁধে। গান ভালই বেঁধেছে।

—বুঝলে কি করে?

—ক'দিন গেয়ে বুঝছি। গান শুনে বেশ ভিড় জমে যায়—লোকে চুপ করে শোনে—আর অনেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, কেউ কেউ কাঁদেও, কিন্তু গান শেষ হলেই সবাই সরে পড়ে—আমি যে চানাচুরওয়ালা এটা তারা ধরতেই পারে না। ভাবে আমি সংসার-ছাড়া কোনো বৈরাগী।

আমি বলিলাম—কিন্তু তোমার গানটা বেশ মন-উদাস করা।

সে বলিল—ওতেই তো মরেছি। মন উদাস হ'লে কি আর চানাচুর কেনার কথা মনে থাকে। কাল থেকে শালা সেই পুরানো গানটা আবার ধরবো।

আমি বলিলাম—আচ্ছা আসি

সে বলিল—বাবু আর এক পয়সার দি—

টিউশন

ইন্দ্র আজ ভারি খুসি স্বর্গে অনেকদিন পরে একজন বাঙালী আসিতেছে। দেবরাজের নির্দ্দেশমত গৃহে গৃহে রঙিন নিশান, দরজায় দেবদারু পাতা ও লাল শালুর তোরণ, জানালায় গাঁদা ফুলের মালা, স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য স্বর্গের দেউড়ি পর্য্যন্ত যাইবেন।—তাঁহার রথ প্রস্তুত। একদল দেব-শিশু শোভাযাত্রা করিয়া দেউড়ির দিকে যাত্রা করিয়াছে। তাহাদের কণ্ঠের মিশ্র চীৎকার মুহুর্মুহু শোনা যাইতেছে। তবে কি বলিতেছে বোঝা যায় না, তাহারাও বুঝিতে পারিতেছেনা। বড় বড় দেবতাদের রথ ছুটিয়াছে, যাঁহাদের রথ নাই, তাঁহারা আজ ভাড়াটে রথে চলিয়াছেন, এমন কি স্বর্গের মহিলাগণ, যাঁহারা দেবী নামে খ্যাত, তাঁহারাও আজ গুণ্ঠন গুটাইয়া সারি বাঁধিয়া চলিয়াছেন। নন্দন লোক আজ সত্যই নন্দিত।

সকলে স্বর্গের দেউড়ির নিকটে অপেক্ষা করিতেছে—স্বয়ং ইন্দ্র ব্যস্ততা সহকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ; কে তাঁহার গলায় মালা দিবে, কে শঙ্খধ্বনি করিবে, কে চন্দনতিলক কাটিয়া দিবে, কে মানপত্র পড়িবে, সমস্ত ঠিক। মাঝে মাঝে রব উঠিতেছে 'ওই আসিলেন, ওই' ; আবার সব নীরব ; কেবল কাবুলিমটর ও চীনে বাদাম বিক্রেতাদের আর্টিষ্টিক কণ্ঠধ্বনি !

অবশেষে সত্যই বহুপ্রতীক্ষিত বাঙালী আসিয়া পড়িলেন—মুহূর্ত্তে তুরী, ভেরী, কাড়া, নাকাড়া, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তিনি গরুর

গাড়ী হইতে নামিলেন, হাতে টীনের একটী স্যুটকেস্ দেবতারা দিব্যদৃষ্টির বলে টিন ভেদ করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একখানি আয়না, একটী চিরুণী ; একটা জুতার বুরূষ ; দাঁতের মাজন ও ব্রাস ; এবং সাবান ও দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম !

ইন্দ্র অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন—বলিলেন, আজ অনেক দিন পরে একজন বাঙালীর স্বর্গে আগমনে আমরা ধন্য হইলাম। স্বর্গে শেষ বাঙালী আসিয়াছিলেন—বিদ্যাসাগর। তারপর হইতে কেবল মাড়োয়ারি, ভাটিয়া প্রভৃতি শেঠজিরা আসিতেছে! টাকাই এখন স্বর্গপ্রাপ্তির মাপকাঠি কাজেই বাঙালীর বড় আশা নাই। এখন যাহারা স্বর্গে আসিতেছে তাহাদের জ্বালায় আমাদের স্বর্গ ছাড়িতে ইচ্ছা করে। তাহারা দন্তধাবনের জন্য ডাল ভাঙিয়া ভাঙিয়া নন্দনবন প্রায় সাবাড় করিয়া দিল ; ঘি ও কাপড়ের বিজ্ঞাপন মারিয়া স্বর্গের বাড়ীঘরের উপর এক ইঞ্চি পুরু কাগজের প্রলেপ ফেলিয়া দিয়াছে, তা ছাড়া দু'দণ্ড যে একটু সদালাপ করিব তাহার উপায় নাই, কেবল তেজিমন্দা, লাভ লোকসানের আলোচনা ; একটু রসিকতা করিতে গেলেই শেয়ার গছাইয়া দিবার চেষ্টা করে। আপনি আসাতে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যাইবে ; দুটা সরস কথা বলিতে পারিব ; বাঙালী কথা বলিতে পারে বটে।··· কিন্তু তার আগে বলুন—আপনি কি চান! স্বর্গের ঐশ্বর্য্য অমূল্য, যা খুসী লইতে পারেন ; খুব সম্ভব সংস্কৃতগ্রন্থাদিতে স্বর্গের ধনরত্নের কথা পড়িয়া থাকিবেন—বলুন দেববাঞ্ছিত এই ঐশ্বর্য্যসম্ভারের মধ্যে কিসে আপনার আকাঙ্খা! উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত বাহন আছে ; পারিজাত মন্দার ফুল আছে, কৌস্তভ মণি আছে, অমৃত পানীয় আছে ; কুবেরের

ভাণ্ডার আছে ; উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরা আছে—বলুন কিসে আপনার বাসনা ; কি আপনি চান ?

বাঙালী বাঁহাত দিয়া মাথার টেরিটা ঠিক করিয়া লইয়া বলিল—প্রভু, আর কিছু নয়—কেবল একটী প্রাইভেট্ টিউশানি।

কাঁচি

আবার জেলে যাইতে হইল—এবারে কিন্তু আমার দোষ নাই—কেন যে নাই সে কথাই আজ বলিব।

এক সময়ে চুরি করিতাম—এখন জর্ণালিজ্‌ম করি ; আমরা নিজেদের বলি সাংবাদিক, লোকে কি বলে না বলাই ভাল।

পকেট কাটিতাম, হাত ছিল কাঁচা, বারংবার ধরা পড়িতে লাগিলাম, এবং বারংবার জেলে যাইতে লাগিলাম। একবার (বোধ হয় পঞ্চম বার) জেল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছি, জেল-গেটে এক ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

আমাকে আবার কোথায় সে দেখিবে ! মনে মনে বলিলাম কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ; মুখে বলিলাম—এইখানেই দেখেছেন। লোকটী বলিল—মনে পড়েছে, এখানেই বটে—এবার নিয়ে ক'বার ?

আমি বলিলাম—পঞ্চম বার !

সে বলিল হাত কাঁচা তো চুরি করতে যান কেন ?

—আর যে কিছু করতে পারি না। সে শিষ দিতে দিতে বলিল—ওটা আপনার ভুল ! আছে আছে, আপনার যোগ্য কাজও আছে ! আচ্ছা লেখাপড়া কতদুর করেছেন ? ভাবিলাম, হায় যদি বা একটু সম্ভাবনা ছিল তাও বুঝি ফস্‌কাইয়া যায় ! সত্য কথাই বলিলাম (এখনও হাত কাঁচা কিনা !) বিশেষ কিছু নয় !

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লোকটির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিল—তা'হলে

ঠিক হবে, চলুন আপনার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।. কৃতজ্ঞচিত্তে লোকটির সঙ্গে চলিলাম। বাসায় পৌছিয়া সে টেলিফোনে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া আমাকে আসিয়া বলিল—ঠিক হ'য়ে গেল। আপনি 'ধুরন্ধর' সংবাদ-পত্রের ষ্টাফে জর্ণালিষ্ট নিযুক্ত হলেন, সম্পাদকের সঙ্গে এই মাত্র কথা বল্‌লাম।

জর্ণালিষ্ট? কিন্তু আমি যে কিছুই জানি না!

সেই তো সব চেয়ে ভাল। শাদা কাগজে লেখা খোলে ভাল: আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। এই বলিয়া সে ধুরন্ধর কাগজের ঠিকানা দিল।

দুপুর বেলা ধুরন্ধর আফিসে গিয়া সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করিলাম। হাঁ সম্পাদক বটে! যেন মিশরের একটি পিরামিড! তিনি পরিচয় শুনিয়া বলিলেন—সন্ধ্যাবেলা এস! ওঃ সে কি ধ্বনি—ঘর গম্ গম্ করিতে লাগিল!

সন্ধ্যাবেলা গেলাম। পিরামিড একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল —বসো! তারপর ডেস্ক খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন—একখানা কাঁচি! বলিলেন—রাত্রি বেলা তোমার কাজ!

শিহরিয়া উঠিলাম! ভাবিলাম সময় রাত্রি, অস্ত্র কাঁচি, পাড়াটারও দুর্নাম আছে, আমিও দাগী, এ কোথায় আসিলাম!

পিরামিড বলিলেন—কাঁচি দিলে কেটে যাবে। সর্ব্বনাশ! ভয়ে

ভয়ে শুধাইলাম—কি ?—পকেট নয় গো, পকেট নয়—পিরামিড হাসিয়া উঠিল। ওঃ সে কি হাসি! যেন ভূমিকম্পে খানকতক পাথর গড়াইয়া পড়িল। হাসি থামিলে বলিলেন—কাগজ! কাগজ! কাগজের কাটিং কেটে সেঁটে দেবে! এরই নাম জর্ণালিজম্—এতে লেখা-পড়ার কি দরকার? আমরা হচ্ছি সরস্বতীর দর্জ্জি!

দর্জ্জিগিরি আজ কয়মাস করিতেছি। দিনে ঘুমাই, রাতে জাগি, দেশী বিলিতি কাগজ কাটিয়া অনুবাদ করিয়া জর্ণালিজম করি। সত্য মিথ্যা ছোট বড় ভাল মন্দর ভেদ ঘুচিয়া গিয়া পৃথিবী বেশ সমতল হইয়া আসিয়াছে।

একদিন রাত্রে কাজ আগেই শেষ হইল—ভাবিলাম বাসায় গিয়া ঘুমাই —বাহির হইয়া পড়িলাম। পথ নির্জ্জন—মোড় ঘুরিতেই একটা হৈ হৈ শব্দ শুনিলাম, দেখিলাম কয়েকজন লোক ছুটিতেছে, কিছু না বুঝিয়া আমিও তাহাদের পিছু পিছু ছুটিলাম, জর্ণালিজম্ আরম্ভ করিবার পর হইতে জনমতকে অনুসরণ করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! সম্মুখে জন তিনেক পুলিশ আসিয়া বাধা দিল, সবাই থামিল, আমিও থামিলাম! পকেট-কাটা গিয়াছে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল—কৌন হ্যায়? ছিন্ন-পকেট ব্যক্তি বলিল—তা তো জানিনে জমাদার সাহেব! জমাদার সাহেব আমাদের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এহি হ্যায়; রাষ্ট্রভাষায় দক্ষতা ছিল না—বলিলাম—নেহি হ্যায়। সে আমার পকেটে হাত চালাইয়া দিয়া টানিয়া বাহির করিল—একখানা কাঁচি। সেই কাঁচি! সকলে হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম—হাম জর্ণালিষ্ট হ্যায়! জমাদার সাহেব বলিল—

শালা চোট্টা হ্যায়! পরিস্থিতি ভয়ানকভাবে আমার বিরোধী—সময় রাত্রি, পাড়া দুর্নামগ্রস্ত, পকেটে কাঁচি, আমিও দাগী!

সে রাত্রি হাজতে থাকিলাম। যথা সময়ে বিচার আরম্ভ হইল—প্রমাণগুলো সব আমার প্রতিকূল! সত্যনির্ণয় কে আর করে? আবার জেলে যাইতে হইল!

পিরামিড একদিন বলিয়াছিলেন—সংবাদপত্রে যাহা বাহির হয় তাহাই সত্য। সে কথা আমার ভাগ্যে ফলিয়া গেল; আমার জেলে যাইবার সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইল; লোকে বিশ্বাস করিল। সংবাদপত্রের উপর এমন অচলা আস্থা যে এক এক সময়ে নিজেরই সন্দেহ হয় সত্যই আমি দোষী না নির্দ্দোষ!

অটোগ্রাফ

স্বর্গে আজ বড় ধুম—ভারি ব্যস্ততা; সকলেই যুগপৎ উৎকণ্ঠ ও উগ্রকণ্ঠ! কিন্তু কেউ স্পষ্টভাবে জানে না কেন এ ব্যগ্রভাব; জিজ্ঞাসা করিলে উচ্চদরের একটা হাসি হাসিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে বোকা বানাইয়া দেয়।

দৈনিক কাগজগুলা আজ একমাস হইল স্বর্গীয়দিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে; আয়োজন চাই আড়ম্বর চাই; কোনখানে কিছু ত্রুটি হইলে স্বর্গের দুর্নাম—অতএব সকলে অবহিত হও। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি তারাও জানে না কেন এ ব্যস্ততা!

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের চতুঃশক্তির বৈঠক বলিয়া গিয়াছে; প্রত্যেকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, তার সেক্রেটারি তস্য সেক্রেটারী উপ সেক্রেটারিদের, ভিড়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি চারজন উহ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—ইনি মহামানব।

বিষ্ণু বলিলেন—যুগাবতার।

মহেশ্বর বলিলেন—কল্কি অবতার।

ইন্দ্র বলিলেন—বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার সময়টা গুরুগৃহে অন্য কাজে ব্যয় করায় কিছুই বলিতে পারিলেন না! এমন গম্ভীর হইয়া রহিলেন যেন ওঁদের কারো কথাই ঠিক নয়।

এমন সময়ে স্বর্গের সিংহদ্বারে তুরী-ভেরী, কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল, বাঁশী, কাঁসি, খোল, করতাল মায় জগঝম্প বাজিয়া উঠিল। যার জন্য সভা তিনিই আসিয়া পড়িয়াছেন, কাজেই সভার আর প্রয়োজন নাই—

চতুঃশক্তি সেক্রেটারি, উপসেক্রেটারি শ্রেণীর সুদীর্ঘ লাঙ্গুল বহন করিয়া সিংহদ্বারের দিকে যাত্রা করিলেন!

সিংহদ্বারে বিষম ভিড়! সকলে জিরাফ-কণ্ঠ হইয়া উঁকি মারিতেছে; সকলেই পার্শ্ববর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কে, কেন, কোথায়, কি?

এমন সময় সকলে দেখিল—যথার্থই তিনি আসিয়াছেন। ক্ষীণ দেহ, কবিদের ভাষায় তনুলতা (লতা যদি কেবল সচল হইত) পায়ে খুর-অলা জুতো (স্বভাবের অভাব কৃত্রিম উপায়ে মেটানো হইয়াছে)! গায়ে স্বচ্ছ বস্ত্র (ক্যালিকো মিলের তৈরী! চুল বব্‌ড করিয়া ছাঁটা (একসঙ্গে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চুলের ভার বহন করিতে ঐটুকু মস্তক সক্ষম নয়)! মুখে ইন্দ্রজিৎ হাসি ও চোখে সূর্য্য-চন্দ্রজিৎ চশমা! হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ! (এমন যে মহিলা তার কি ভ্যানিটি থাকিতে পারে, ওটা বোধ করি মিথ্যা বলিয়াই ঠাট্টা করিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ বলা হয়।) পিছনে একটি রোঁয়ায় ভর্ত্তি কুকুর! (কুকুর ছাড়া কেউ কি স্বর্গে যাইতে পারে—যুধিষ্ঠিরের কথা ভাবিয়া দেখুন!)

তিনি বলিলেন—দেবগণ! আমি৷বাঙালিনী!

ব্রহ্মা বলিলেন—আর পরিচয়ে প্রয়োজন নাই! পুরাণে আপনার কথা আছে।

বিষ্ণু বলিলেন—আমরা কৃতার্থ।

মহেশ্বর বলিলেন—অবশ্যই।

ইন্দ্র বলিলেন—কিছুই বলিলেন না। তাঁর গুরুগৃহের কথা মনে পড়িয়া গেল।

ব্রহ্মা বলিলেন—বাঙালিনী, আপনার আগমনে স্বর্গ চরিতার্থ, দেবগণ

কৃতার্থ, নন্দনবন আজ নন্দিত যথার্থ—(বক্তৃতার বাকি অংশ ভুলিয়া যাওয়ার রিপোর্ট করা গেল না।)

বিষ্ণু বলিলেন—স্বাগতম্।

মহেশ্বর বলিলেন—অবশ্যই।

ইন্দ্র বলিলেন—(এবারে তিনি সত্যই বলিলেন) বলুন বাঙালিনী আপনার কি চাই। স্বর্গের ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, অমরত্ব, দেবত্ব, সব আপনার পদতলে।

বাঙালিনী কোন উত্তর না দিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একখানি ছোট খাতা আর একটি ফাউন্টেন পেন খুলিয়া ইন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—আর কিছু চাই না—কেবল একটি অটোগ্রাফ!

ইন্দ্র স্বাক্ষর করিলেন।

বিষ্ণু স্বাক্ষর করিলেন!

ব্রহ্মা স্বাক্ষর করিলেন।

মহেশ্বর স্বাক্ষর করিলেন।

সেই হইতে স্বর্গের তেত্রিশ কোটি অধিবাসী অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে মাতিয়া উঠিল—স্বর্গে ও ছাড়া আর কোন কাজ নাই, চিন্তা নাই!

ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর চতুঃশক্তি এখন কেবল অটোগ্রাফ স্বাক্ষর করিতেছেন—অন্যদিকে মন দিবার তাঁদের সময় নাই।

এদিকে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, প্রলয়, প্লাবন, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও গদ্য কবিতা রচনা চলিতেছে।

তার কারণ চতুঃশক্তির সমস্ত শক্তি অটোগ্রাফ বিতরণে নিঃশেষে নিযুক্ত।

সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী

অবশেষে সিন্ধবাদ তাহার অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী আরম্ভ করিল। সে বলিতে লাগিল যে আমি ও আমার ভাই হিন্দবাদ দুইখানি জাহাজ সাজাইয়া যাত্রা করিলাম। বসোরা নগর ত্যাগ করিয়া আমরা পারস্যোপসাগরে পড়িলাম, এবং ক্রমে আরব সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আরব সাগর দিয়া ক্রমাগত কয়েকদিন দক্ষিণ দিকে চলিবার পরে একটি নারিকেল কুঞ্জের মত সিংহল দ্বীপ চোখে পড়িল। সিংহল অতিক্রম করিয়া ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোত্তরে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস চলিবার পরে হিন্দুস্থানের উপকূল দৃষ্ট হইল। আমি সর্ব্বদা নাবিকের কাছে বসিয়া থাকিতাম এবং কোন নূতন দেশ দেখা গেলেই, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতাম। এইরূপ ভাবে জানিলাম যে পশ্চিমে উৎকল, কলিঙ্গ ও অঙ্গদেশ, আর পূর্ব্বে নাপ্পিভোজী ব্রহ্মদেশ—আর যে দেশে আমাদের জাহাজ চলিয়াছে, তাহা এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী রঙ্গদেশ। এইরূপ অদ্ভুত নাম কখনো শুনি নাই; নাবিক বলিল—সে দেশের লোকেরা আরও অদ্ভুত! সে আরও বলিল যে ঐ দেশে গেলে লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি কারণ তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য জানে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তবে তাহারা কি করে? সে বলিল তাহারা পত্নীচর্চ্চা প্রত্নচর্চ্চা করিয়া জীবন ধারণ করে। আমি এইদেশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কয়েক দিন পরে আমাদের জাহাজ দুইখানি একটি সুবৃহৎ নদীর

মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই দেশের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তীরে নামিয়া বুঝিলাম সত্যই এমন দেশে কখনো ইহার পূর্ব্বে আসি নাই।

আমরা সকলে অবাক্ হইয়া গেলাম, ইহারা কি মানুষ না অন্য কোন জাতীয় জীব! হিন্দবাদ ও আমি শহরে প্রবেশ করিলাম। এ দেশের অধিবাসীদের দেখিতে মানুষের মতই; হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ মস্তক সবই আছে; মস্তিষ্ক আছে কিনা তাহা সব সময়ে মস্তক দেখিয়া বুঝা যায় না বলিয়া বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাদের গাত্র আগা-গোড়া ভেড়ার চামড়া দিয়া আচ্ছাদিত; কাজেই একটা ভেড়া দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটিলে যেমন দেখিতে হয় ইহারাও অনেকটা তেমনি।

আমি হিন্দবাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরে হিন্দা—ইহারা মানুষ না ভেড়া?

হিন্দা বলিল—বোধ হয় মানুষ, কিন্তু শীতের তীব্রতার জন্য ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়াছে। আমি বলিলাম—সে কি রে, গরমে আমরা ঘামিয়া মরিতেছি, শীত কোথায়?

ইহা শুনিয়া হিন্দা বলিল—তাও তো বটে!

সে আরও বলিল—ইহাদের জিজ্ঞাসা করা যাক্ না!

তখন আমরা অগ্রসর হইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয় আপনারা কি মানুষ?

সে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এমন অপমান আমাদের এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই! আমরা মানুষ নই!

আমরা নরম হইয়া বলিলাম যে আমরা বিদেশী মানুষ, কাজেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি।

সে খানিকটা শান্ত হইয়া বলিল আমরা মানুষ নই। তোমরা ঐ প্রশ্ন এ দেশের কাহাকেও করিও না—কারণ এ দেশের সব চেয়ে বড় গালি হইতেছে কাহাকেও মানুষ বলা। শুনিয়াছি এই রঙ্গদেশের বাহিরে যে-ভূখণ্ড আছে তাহাতে একপ্রকার অসভ্য জীব বাস করে তাহাদেরই নাম মানুষ। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, রাজনীতি নামে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে; তাহারা ঈশ্বর নামে এক উপদেবতায় বিশ্বাস করে; অন্যের স্ত্রীকে তাহারা সম্মান করে; পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করা তাদের মধ্যে নিন্দনীয়, এমন কি কোন বস্তু বলিয়া লইলেও তাহা আবার ফিরাইয়া দিতে হয়। আমরা ঐরূপ অসভ্য নই, আমাদের মধ্যে যাহারা গর্হিত আচরণ করে তাহাদের আমরা 'মানুষ' বলিয়া গালি দিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রগতিপন্থী শুনিয়াছি তাহারা অত্যন্ত গোপনে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিয়া থাকে।

আমরা বিনীতভাবে বলিলাম যে এতক্ষণে আমাদের বোধোদয় হইল, কিন্তু আপনাদের সম্যক্ ইতিহাস জানিতে বাসনা; কোথায় গেলে জানিতে পারিব?

সে বলিল এই পথ ধরিয়া সোজা চলিয়া প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইবে—উহা এ দেশের কেতাবখানা—সেখানে খোঁজ করিও, এ দেশের পুরাতত্ত্ব জানিতে পারিবে। আমরা দুই জনে কেতাবখানার উদ্দেশ্যে চলিলাম।

২

কেতাবখানায় গিয়ে রঙ্গদেশের ইতিহাস ঘাঁটিয়া যাহা উদ্ধার করিলাম, তাহা এইরূপ।

খৃষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে হিন্দুস্থানে নবাগন্তুক জাতিসমূহ আশ্রয় স্থান অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একদল রঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া এক অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। প্রায় একমাস এই জটিল অরণ্যের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরিয়া যখন তাহারা অনাহারে, অনিদ্রায়, পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে তাহারা একদল ভেড়ার সাক্ষাৎ পাইল। তখন তাহারা এই গড্ডালিকাকে অনুসরণ করিয়া সেই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেহেতু তাহারা ভেড়ার দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাণে বাঁচিল ও এমন স্বর্গতুল্য দেশে আসিয়া পৌছিল, সেইজন্য এই মেষপালের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ভেড়াগুলিকে মারিয়া নিজেরা সেই চর্ম্ম পরিধান করিল। (বাহুল্য হইলেও বলিয়া রাখি, ভেড়ার মাংস তাহারা নষ্ট করিল না, আহার করিয়া ফেলিল; রঙ্গদেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইহা প্রধান লক্ষণ)। তারপর হইতে এই মেষচর্ম্ম আর কখনো তাহারা ছাড়ে নাই। ফলে হইল এই যে কালক্রমে, বহু সন্তান সন্ততি পরম্পরায় এই মেষচর্ম্মকেই তাহারা নিজেদের চর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিল; তাহারা নিজেদের এক জাতীয় ভেটক (ভেড়া)

ভাবিতে লাগিল; এক সময়ে যে তাহারা মানুষ ছিল তাহা ভুলিয়াই গেল। এখন তাহাদের এই মেষচর্ম্মের প্রতি এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা যে কেহ তাহাদের মানুষ বলিলে বিষম অপমানিত বোধ করে। আমি হিন্দবাদকে বলিলাম, দেখ ইহারা মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

হিন্দবাদ বলিল—দাদা; এই মেষচর্ম্ম অত্যন্ত মূল্যবান, এবারকার বাণিজ্যযাত্রায় এই বস্তু সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হইবে। ইহাতে অত্যন্ত মূল্যবান্ পাদুকা হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহা কিরূপে সম্ভব!

সে বলিল—চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? চল না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।

তখন আমরা পরামর্শ করিতে করিতে শহরের দিকে অগ্রসর হইলাম!

৩

ক্রমে শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা উজির, কেহ বা নাজির, কেহ বা কোটাল! একদিন তাহারা ধরিয়া বসিল, তোমাদের দেশের কথা আমাদিগকে বল!

একজন প্রশ্ন করিল—আচ্ছা মানুষ কি রকম জীব? তাহারা তোমাদের মতই দ্বিপদ জীব না চতুষ্পদ?

আমি বলিলাম—মানুষ শৈশবে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ ও বার্দ্ধক্যে ত্রিপদ (লাঠি একখানা পা) বিশিষ্ট জীব। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ তাহাদের আদিপুরুষ ভেড়ার কৃপায় অতি সহজেই তাহারা চতুষ্পদ।

আর একজন প্রশ্ন করিল—শুনিয়াছি তাহারা সকলেই সমান ইহা কিরূপে সম্ভব ?

আমি বলিলাম কেন সম্ভব নয় ? মানুষের মধ্যে কেহ বা গাড়ীতে চাপে আর কেহ বা সেই গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে। অসাম্য কোথায় ?

পুনরায় প্রশ্ন হইল—সাম্য কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ—ধনীর গাড়ীতে চাপা পড়িয়া মরিবার অধিকারকে সাম্য বলে।

তাহাদের মধ্যে একজন লেখক ছিল (লেখক মাত্রই সাহিত্যিক) সে আমার উত্তর লিখিয়া লইতে লাগিল।

প্রশ্ন ঃ—মৈত্রী কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ—ধনীর বিলাসের জন্য দরিদ্রের খাজনা দিবার অধিকারের নাম মৈত্রী ?

প্রশ্ন ঃ—স্বাধীনতা কি ? কোন প্রসাধন দ্রব্যের নাম, না, মুদ্রা বিশেষের নাম ?

উত্তর ঃ—(মনে মনে) মূর্খ, স্বর্গীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানো না। তাই তোমাদের এ দশা ! (উচ্চস্বরে) রাজনীতিকদের খেয়ালে ও মূঢ়তায় পর রাজ্যের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়া উঠিলে, অকাতরে, নির্ব্বিচারে, অকারণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মরার যে মৌলিক অধিকার তাহারই নাম স্বাধীনতা।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা মাঝে মাঝে কড়ি-মধ্যমে ব্যা-ব্যা (মানব ভাষায় বাঃ বাঃ) করিতে লাগিল।

প্রশ্ন ঃ—সত্য কি ?

উত্তর ঃ—সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন :—সংবাদ পত্র কি ?

উত্তর :—মূর্খ যাহারা লেখক, ধূর্ত্ত যাহারা সম্পাদক, গুণ্ডা যাহার প্রকাশক, শঠ যাহার সত্বাধিকারী, রাত্রে যাহা বিছানার চাদর, দিনে যাহা সংগ্রামের ধ্বজা (কপিধ্বজ) ; চুল ছাঁটিবার সময়ে যাহা জামা, ভাত খাইবার সময়ে যাহা টেবিল ক্লথ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা যাহা যৌন তত্ত্ব শিক্ষা দেয়, মিথ্যা যাহার বারো আনা এবং ভুল যাহার চার আনা তাহাই সংবাদ পত্র।

প্রশ্ন :—কবিতা কে ? অবশ্যই কোন বারাঙ্গনার নাম ? তাহার বয়স কত ?

উত্তর :—মানসিক কণ্ডূয়নের কাগজিক আত্ম-প্রকাশের নাম কবিতা।

প্রশ্ন :—তবে তাহার জন্য লোক এত পাগল কেন ?

উত্তর :—আমরা যে মানুষ।

প্রশ্ন :—মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে ?

উত্তর :—সংবাদপত্র দিয়া জাগরণ ; আহারের কালে বাড়ীর শিশু, মহিলা ও দাসদাসীদের বঞ্চিত করিয়া শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি ভক্ষণ ; ব্যবসায়িক সততার নামে প্রবঞ্চনা ; বিকালে খেলা, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি মহৎ প্রতিষ্ঠানে গমন, সেগুলি বন্ধ থাকিলে দেশের কাজ করিবার জন্য সভা-সমিতিতে যোগদান কিন্তু চাঁদার খাতা বাহির হইলেই পলায়ন এবং মহৎ সঙ্কল্প লইয়া নিদ্রাগমন, সংক্ষেপে ইহাই মনুষ্যত্ব।

প্রশ্ন :—বিশ্বপ্রেম কি ?

উত্তর :—প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য না করিবার চিত্তাকর্ষী অজুহাত।

প্রশ্ন :—মিথ্যা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ—নিজের মুখে যাহা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এবং পরের মুখে যাহা শুনিলে ধিক্কার ও ঘৃণার ভাব মনে জাগ্রত করে—তাহাই মিথ্যা।

প্রশ্ন ঃ—রাজনীতি কি ?

উত্তর ঃ—রাত্রের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য বাক্‌ব্যায়াম। এই জন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক সভা সন্ধ্যাবেলা আহূত হয়।

প্রশ্ন ঃ—ধর্ম্ম কি ?

উত্তর ঃ—নৈশ-ব্যসনের ক্লান্তি দূর করিবার উপায় ; এইজন্য অধিকাংশ ধর্ম্ম-চর্চ্চা, পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক ও উপাসনার সময় প্রাতঃকাল।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা একবাক্যে বলিল—আহা আমরা যদি মানুষ হইতাম।

আমি বলিলাম—ইহাতেই এত উৎসাহ ! মনুষ্যত্বের দুটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কথা তো এখনো বলি নাই।

তাহারা বলিল—শীঘ্র বল।

আমি বলিলাম—সে দুটি গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ।

প্রশ্ন ঃ—সে কি ?

উত্তর ঃ—কোন পুরুষের গাঁঠে টাকাকড়ি আছে সন্দেহ করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে নিপুণ আঙুলে তাহা খসাইয়া ফেলিয়া অর্থ সংগ্রহের নাম গ্রন্থিচ্ছেদ।

প্রশ্ন ঃ—আর নীবিচ্ছেদ ?

উত্তর ঃ—টাকাকড়ি না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে (জ্ঞাতসারে হইলে অন্য নাম আছে) বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র বিমোচনের নাম নীবীচ্ছেদ। এই দুইটি মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ। যে মনুষ্যজাতি এ দুটিতে অনভ্যস্ত অন্য সব

জাতি তাহাকে অসভ্য, অমানুষ, সংস্কৃতিহীন, সেকেলে, প্রাচ্য, পরাধীন, বুর্জোয়া বলিয়া থাকে ।

তখন তাহারা একযোগে বলিল—তুমি আমাদিগকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও, আমরা গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ করিতে শিখিব—মনুষ্যত্ব যে এত লোভনীয় জানিতাম না। এমন কি এক একবার তাহা মেষত্বের অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া মনে হইতেছে।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমি গ্রন্থিচ্ছেদ শিখা তে পারি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাদিগকে মেষচর্ম্ম ছাড়িতে হইবে!

তাহারা শিহরিয়া উঠিল। সে কি কথা। আমরা রঙ্গিলা জাতি, আমাদের আদিপুরুষ মহামেষ—এই মেষচর্ম্মের জন্যই আমরা টিকিয়া আছি; হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতির মধ্যে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য তাহা এই মেষচর্ম্মপ্রসূত, আমাদের মহাকবি জাতীয় সঙ্গীতে এই গণমনোভাবকে রূপ দিয়া গিয়াছেন "মানুষ আমরা নহিতো, মেষ।" সেই চর্ম্ম পরিত্যাগ করিব?

আমি বলিলাম তাহা হইলে গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিতে পারিলে না। কারণ গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা বিশেষ ভাবে মানুষেরই বিদ্যা, মেষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

কি আশ্চর্য্য! গ্রন্থিচ্ছেদের এমনই মহিমা যে তাহারা কিছুক্ষণ আলোচনার পরে এক দিনের জন্য মেষচর্ম্ম ছাড়িতে স্বীকার করিল।

আমি বলিলাম—মানুষের সঙ্গে তোমাদের ঐক্য ঘনিষ্ঠ, কাজেই এক দিনেই তোমরা গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহারা সুখী হইয়া মেষচর্ম্ম ছাড়িতে গেল। আমি হিন্দবাদকে চোখ টিপিলাম, সে বলিল—তুমি ইহাদিগকে শিক্ষা দাও, ততক্ষণে আমি চর্ম্মগুলি জাহাজে তুলিয়া ফেলিব। শেষে আমার সঙ্কেত পাইলে তুমি গিয়া জাহাজে উঠিবে।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা মেষচর্ম্ম ছাড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; এখন আর তাহাদের মানুষ ছাড়া কিছু মনে করিবার উপায় নাই। তাহারা বলিল—কই আমাদের গ্রন্থিচ্ছেদ শিক্ষা দাও।

আমি বলিলাম মনে কর—খাজাঞ্চী সাহেবের গাঁঠে টাকা আছে, তুমি উজীর সাহেব, এমনভাবে তাহা বাহির করিয়া লও, যেন সে বুঝিতে না পারে। (আমাদের দেশে খাজাঞ্চি সাহেব অন্যের গাঠ কাটে, তাহাকে মনে মনে জব্দ করিবার জন্য তাহার গাঠ কাটিতে বলিলাম।) উজীর সাহেব তাহার গাঁঠে হাত দিতেই খাজাঞ্চি ধরিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম—হইল না। ধরা পড়িলে চলিবে না। আবার চেষ্টা কর। উজীর সাহেব আবার চেষ্টা করিল। কখনো বা নাজির সাহেবকে বলিলাম যে তুমি কোটাল সাহেবের গাঠ হইতে অজ্ঞাতসারে টাকা বাহির করিয়া লও! তাহারা গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিয়া মানুষ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি তাহাদের উৎসাহিত করিয়া বলিলাম— যদিও তোমাদের হাত এখনো কাঁচা, বারংবার ধরা পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু অচিরে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে। এই অল্পকালের মধ্যে তোমরা যে দক্ষতা লাভ করিয়াছ, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় বাহিরের প্রভেদ সত্ত্বেও তোমরা মূলত মানুষ! প্রতিদিন তোমরা যদি এক প্রহর ধরিয়া এইরূপে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিতে থাক—তবে একমাসের মধ্যেই গ্রন্থিচ্ছেদে, নীবীচ্ছেদে, বিশ্বাসঘাতকতায়, কৃতঘ্নতায়, মিথ্যাভাষণে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। তাহারা আমার আশ্বাস বাণীতে আনন্দিত হইয়া গ্রন্থিচ্ছেদের মহড়া দিতে লাগিল—এমন সময়ে হিন্দবাদের সঙ্কেতধ্বনি বাজিয়া উঠিল—আমি তাহাদের অগোচরে পালাইয়া আসিয়া

জাহাজে উঠিলাম, দেখিলাম হিন্দবাদ ভায়া কাজের লোক, বহু চর্ম্ম জাহাজে তুলিয়াছে। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

তাহারা আমাকে না দেখিতে পাইয়া প্রথমে চামড়াগুলির সন্ধান করিল; দেখিল চামড়া নাই; তখন তাহারা বুঝিল চামড়াগুলি অপহরণ করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়াছি; তাহারা ছুটিয়া আসিয়া জাহাজ ঘাটায় দাঁড়াইল—কিন্তু জাহাজ তখন মাঝ নদীতে।

তাহারা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওগো, এ কি করিলে, শেষে আমাদের মানুষ করিয়া রাখিয়া গেলে—আমরা কি করিয়া রঙ্গদেশে মুখ দেখাইব। মেষচর্ম্মই ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য, জগতে রঙ্গিলাজাতির বিশিষ্ট 'অবদান', তাহা গেলে আমাদের বাঁচিয়া কি লাভ, তাহা গেলে মরিয়াও যে আমাদের সান্ত্বনা নাই। হায় হায় শেষে তোমার মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়া আমরা মানুষ হইলাম!

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—দুঃখিত হইও না! তোমরা মানুষ হও নাই। বাহিরটা মানুষের মত হইলেই মানুষ হয় না—তাহা হইলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকিত না! তোমরা চুরি জানো না, বাটপাড়ি জানো না, কাজেই তোমরা অর্থনীতি জানো না, তোমরা পরস্ত্রীহরণ জানো না, অন্যকে হনন করিতে জানো না, কাজেই রাজনীতি জানো না; তোমরা মনোভাব গোপন করিতে জানো না, মিত্রকে বিপদে ফেলিতে জানো না, কাজেই তোমরা ধর্ম্ম জানো না; তোমরা গাড়ী-চাপা দিয়া দরিদ্রকে মারো না—তোমাদের মধ্যে সাম্য কই! তোমরা দরিদ্রের গলা টিপিয়া শিশুর দুধের কড়ি অপহরণ করিতে পারো না, তোমাদের মধ্যে মৈত্রী কই! তোমরা অসহায়কে নিজেদের খেয়ালের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে

কচুকাটা করিতে পাঠাও না, তোমাদের মধ্যে স্বাধীনতা কই! সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, বায়ু পিত্ত কফের মত মানব দেহকে সজীব করিয়া রাখে, তাহা না থাকায় তোমরা মানুষ কিরূপে! আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি তোমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, তোমরা মানুষ নও, এবং কখনো হইতে পারিবে না। মানুষ যে কাহাকে বলে হাতে হাতে তাহার প্রমাণ তো পাইলে, কেমন কৌশলে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া চামড়াগুলি লইয়া পালাইলাম!

তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমাদের মহাকবি যে বলিয়া গিয়াছে—

মানুষ আমরা নহিতো, মেষ!

তাহার কি হইবে? লোকে বুঝিবে কেন? তাহারা আমাদের আকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া ঠাহর করিয়া রাখিবে। আর আমাদের জাতীয় সঙ্গীতই বা কোন্ মুখে গাহিব।

আমি বলিলাম, জাতীয় সঙ্গীতের জন্য ভয় করিওনা, কবি অত্যন্ত কৌশলে উহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে দৈবক্রমে মানুষ হইলেও তোমরা উহা অনায়াসে গাহিতে পারো, কেবল ঐ ছত্রটির মধ্যে যে 'কমা' আছে, তাহাকে একটু ঠেলিয়া আগের দিকে বসাইয়া দাও, তখন ছত্রটি হইবে—

মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।

আমার এই পরম সান্ত্বনা বাক্যেও তাহারা শান্ত হইল না;—মেষ-চর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া তাহারা ঐক্যতনে কাঁদিতে থাকিল। কিন্তু জলের কল্লোলে, বাতাসের নিঃস্বনে তাহা আর শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। হিন্দবাদ আসিয়া বলিল—দাদা, এ যাত্রায় আমাদের বাণিজ্য ভালই হইল—এ সব চামড়া বেচিলে মোটা মুনাফা হইবে।

নর-শার্দ্দুল সংবাদ

আমি কমলাকান্তের মত আফিং খাই নাই, কিন্তু খাইবার ইচ্ছা ছিল। তাহাতেই এমন ঘটিল কি না কে বলিতে পারে? কি ঘটিল তাহা না জানিলে কেমন করিয়া আপনারা বিচার করিবেন! তবে আগে তাহা-ই মন দিয়া শুনুন।

আমার ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল—বন্দুক হাতে একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে পাশেই একটা নিহত বাঘ; মানুষ বাঘটাকে শিকার করিয়াছে। আমি শুনিতে পাইলাম মানুষ ও বাঘটার মধ্যে কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে। আপনারা বলিবেন মরা বাঘ কেমন করিয়া কথা বলে! কিন্তু ছবির বাঘই বা কেমন করিয়া কথা বলিতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হয় তবে মরা বাঘই বা বলিবে না কেন? কিন্তু খুব সম্ভব বাঘটা মরে নাই—আধমরা হইয়াছিল মাত্র।

বাঘটা বলিল—আমাকে মারিলে কেন?

মানুষ উত্তর দিল—তুমি যে পশু!

বাঘ—পশু তাহাতে কি হইয়াছে?

মানুষ—পশুমাত্রেই নীচ, মানুষ মাত্রেই মহৎ।

বাঘ—বিষয়টা লইয়া তর্ক চলিতে পারে কিন্তু এখন তাহা করিব না। অন্য প্রশ্নের সমাধান আগে করা যাক্—মহৎ নীচকে মারিবে ইহাতে মাহাত্ম্য কোথায়?

মানুষ—ও তুমি বুঝিবে না।

বাঘ—ওই তোমাদের এক কথা! বুঝিব না! কেন বলিতে পার? কিন্তু তোমরা যে সত্যই পশুর অপেক্ষা বড় ইহা তো তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় না!

মানুষ—কেন?

বাঘ—কেন কি? পশুকে তোমরা অনেক বিষয়ে আদর্শ মনে কর।

মানুষ—কি রকম?

বাঘ—এই দেখ না কেন—তোমাদের মধ্যে যাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ তাহাদের তোমরা নরসিংহ, পাঞ্জাবকেশরী, নরপুঙ্গব বলিয়া থাক। কাহারো দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলে তাহাকে বল শ্যেনদৃষ্টি, কাহারো বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইলে তাহাকে জম্বুকের সঙ্গে তুলনা কর। তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডকে বল—বৃটিশসিংহ; শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বহু প্রচলিত নাম—ভল্লুক! এ সব তবে কি?

মানুষ—ওগুলা নেহাৎ রূপক।

বাঘ—অর্থাৎ তর্ক এড়াইয়া যাইবার একটা ছুতা মাত্র!

মানুষ—তর্ক করিতে আমি খুব রাজি আছি। মানুষে তর্ক করিতে ভীত এমন অপবাদ কেহ আজো দিতে পারে নাই। যাহাতে তর্কের কিছু নাই এমন একটা প্রশ্ন করি! তোমরা মানুষ মারো কেন?

বাঘ—মানুষ মারি কারণ মানুষ আমাদের খাদ্য। তোমরা বাঘ ভালুক মারো, বাঘ ভালুক কি তোমাদের খাদ্য? কেন, চুপ করিয়া থাকিলে কেন? আমাদের মানুষ মারিবার একটা কারণ আছে তোমাদের তো সে কারণ নাই!

মানুষ—মানুষ তোমাদের খাদ্য একথা কে বলিল?

বাঘ—কে বলিল তাহা জানি না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আমরা মানুষ খাইয়া আসিতেছি—উহাতে আমাদের একটা কায়েমী স্বত্ব দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মানুষ—ইহা অন্যায়।

বাঘ—অন্যায় হইলে সে অন্যায় ভগবানের। ও তোমরা বুঝি আবার ভগবান মানো না। কি মানো ডারউইন সাহেবকে? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও—শক্ত অশক্তকে গ্রাস করিয়া ফেলে কিনা!

মানুষ—তুমি কিছু কিছু বিদ্যাও আয়ত্ত করিয়াছ দেখিতেছি!

বাঘ—করিব না! বহু জন্মজন্মান্তর মানুষ খাইতে খাইতে কিছু মনুষ্যত্ব আয়ত্ত হইয়াছে বই কি?

মানুষ—তাহা যদি হইয়া থাকে আমার কথাগুলা বুঝিতে পারিবে। মানুষ পশুর অপেক্ষা বড় এই জন্য যে সে কেবল নিজের জন্য ভাবে না পশুর জন্যও ভাবিয়া থাকে।

বাঘ—দু-একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও—কথাটা বড় গভীর মনে হইতেছে

মানুষ—দেখনা কেন—আমরা পশুদের আরামের জন্য পিঁজরা-পোল সৃষ্টি করিয়াছি; চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছি, সি-এস্-পি-সি-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এমন কি রাজপথের পাশে পাশে তৃষিত পশুর জন্য জলাধার তৈরি করিয়া দিয়াছি।

বাঘ—তোমার কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু এখনো তোমার গুলিটা পাঁজরায় বিঁধিয়া আছে, লাগিতেছে।

মানুষ—হাসি পাইতেছে কেন?

বাঘ—পাইবে না? এমনভাবে কথাগুলি বলিলে যেন মানুষের সব দুঃখ দূর করিয়াছ, এখন উদ্বৃত্ত শক্তি দিয়া পশুর দুঃখ দূর করিতে লাগিয়া গিয়াছ।

মানুষ—তুমি নেহাৎ পশু।

বাঘ—তোমাকে অপমান করিবার জন্য গালি দিবার প্রয়োজন নাই অত্যন্ত সত্য কথাটা বলিলেই চলিবে—তুমি নেহাৎ মানুষ! রাগ করিও না শোন! মহিষের বা গরুর গাড়ীতে অতিরিক্ত মাল চাপাইলে পোষাক-পরা কর্ম্মচারী আসিয়া গাড়োয়ানকে লইয়া টানাটানি করে এবং অবশেষে কিছু পয়সা (তোমরা বোধ হয় ইহাকে ঘুষ বল) লইয়া ছাড়িয়া দেয় দেখিয়াছি। ইহাতে পশুর দুঃখ তো কমেই না বরঞ্চ মানুষের দুঃখ বাড়ে।

মানুষ—কেন?

বাঘ—কারণ ওই ঘুষের পয়সাটা ওয়াশীল করিয়া লইবার জন্য পশুদুটাকে আরো বেশী করিয়া খাটায়। কিন্তু বাপু, রিক্সাতে দুইজনের জায়গায় পাঁচজন চাপিলে তো রিক্সাওয়ালাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা তোমরা কর নাই।

মানুষ—ইচ্ছা করিয়াই করি নাই।

বাঘ—কেন?

মানুষ—রিক্সাওয়ালা মানুষ, স্বাধীন জীব, আর পশু পশুমাত্র, তাহার স্বাধীন-সত্তা বলিয়া কিছু নাই—নিজের ইচ্ছার মালিক সে নিজে নয়। কাজেই তাহাকে রক্ষা করিবার ভার মানুষের উপর।

বাঘ—একটিপ নস্য দিতে পার?

মানুষ—নস্য লইবার অভ্যাস আমার নাই।

বাঘ—মানুষ যে স্বাধীন আর পশু পরাধীন এ কথা কে বলিল?

মানুষ—কে আবার বলিবে?

বাঘ—আমি বলিতেছি শোন। মানুষই পরাধীন—পশুর নিজের ইচ্ছার মালিক নিজে।

মানুষ—এ-যে উল্টো কথা।

বাঘ—কিন্তু সত্য কথা। তবে শোন। দুপুরবেলা রাজপথে গাড়ী টানিতে টানিতে ক্লান্ত হইলে মহিষ রাজপথে পড়িয়া যায়—গাড়োয়ানে গুঁতা মারে, টানাটানি করে, কিন্তু সে নিজের ইচ্ছার মালিক বলিয়াই আর ওঠে না, দিব্যি পড়িয়া থাকে। আর রিক্সাওয়ালা ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেও তাহার নিস্তার নাই। কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে উঠিয়া আবার গাড়ী টানিতে হয়।

মানুষ—কারণ, সে স্বাধীন।

বাঘ—না, কারণ সে পরাধীন। তাহার উপরে একটি পরিবারের ভার; তাহার ক্লান্ত হইলে চলিবে না, থামিলে চলিবে না, বসিয়া পড়িলে চলিবে না—যেমন করিয়াই হোক ঐ যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া পয়সা কামাই করিতেই হইবে ইহার মধ্যে স্বাধীনতা কোথায়? পশুকে পরিবার পালন করিতে হয় না—কাজেই নিজের মালিক সে নিজে। মানুষকে পরিবার পালন করিতে হয়, নিজের মালিক সে নিজে নয়, অপরে এখন কথাটা বুঝিলে?

মানুষ—তোমরা অকৃতজ্ঞ।

বাঘ—আবার তর্ক করিতে হইল দেখিতেছি। এযাবৎকাল মানুষ জাতিহিসাবে পশুকুলের উপরে যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, তাহারই

অভিশাপে তোমাদের এই দণ্ড। তোমরা স্বাধীন হইয়াও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেছ না। প্রথমে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম যে তোমরা পশুকে বড় মনে কর বলিয়াই তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের সিংহ, ব্যাঘ্র, করী প্রভৃতি বল। আসল কথা কি জানো বহুজন্মের আচরণগত পাপে তোমরা পশুর স্তরে নামিয়া আসিয়াছ, কাজেই ঐ বিশেষণগুলি সত্যই তোমাদের প্রাপ্য—উহাতে অন্যায় কিছুই নাই।

মানুষ—তুমি লজিক পড় নাই, ইতিহাস জানো না, অর্থনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে পারিব না! কিন্তু আবার বলিতেছি তোমরা অকৃতজ্ঞ।

বাঘ—আর তোমরা কৃতঘ্ন।

মানুষ—কেন?

বাঘ—পশুরা তোমাদের উপকার করে আর তোমরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের মারিয়া ফেল—ইহাকে তো তোমাদের ভাষাতে—কৃতঘ্নতা-ই বলে।

মানুষ—ইহার উত্তর তো আগেই দিয়াছি তোমরা নীচ!

বাঘ—তা-ই বটে!

মানুষ—বিস্মিত হইলে কেন?

বাঘ—হইব না! পশুরা মদ খাইয়া নেশা করে না, তোমরা কর; পশুরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রী নষ্ট করে না, তোমরা কর; পশুরা অকারণে হত্যা করে না তোমরা কর; পশুদের জন্য নিরস্ত্রীকরণ সমিতি করিতে হয় না তোমাদের জন্য করিয়াও লাভ হয় না; পশুরা ধর্ম্ম-প্রচার উপলক্ষ্যে নিরীহ, নিরস্ত্র জাতিকে ধ্বংস করে না, তোমরা

কর ; পশুরা বানিজ্য-বাদ নামে নূতন এক ধরণের ডাকাতির নাম শোনে নাই—তোমরা তাহার সৃষ্টি করিয়াছ, পশুরা সভ্যতাপ্রচার উপলক্ষ্যে অপরের দেশ অধিকার করে না, তোমাদের মধ্যে যাহারা করে তাহারা বীর পুরুষ ; পশুরা সংবাদ-পত্র চালনা উপলক্ষ্যে মিথ্যাকে সত্যের ছদ্মবেশে ছড়াইয়া দেয় না, তোমাদের মধ্যে উহার নাম জর্ণালিজম্ ; তোমাদের মনে এক কথা, মুখে আর এক কথা—পশুরা কথাই বলিতে পারে না ; তোমাদের সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিতে পাই বিশেষ একটা দণ্ডনীয় অপরাধ পাশবিক বলিয়া আখ্যাত—আর কিছুদিন এইরূপ প্রচার চলিলে পশুরা ইহা তোমাদের কাছ হইতে শিখিয়া লইবে—এবং বলিবে 'I thank the jew for teaching me the word.'

মানুষ—তোমরা সংবাদপত্র পড় না কি ?

বাঘ—যতজন সংবাদপত্র পড়ে তাহার অধিকংশই পশু।

মানুষ—সত্যই তোমার নিকটে অনেক কিছু শিখিবার আছে। চল, তোমার গুলিটা বাহির করিয়া দিই।

বাঘ—ও বুঝিয়াছি। গুলি মারিয়া প্রাণের যে-টুকু বাকী আছে, সে-টুকু ওষুধ ও ছুরি দিয়া শেষ করিয়া দিতে চাও। কিন্তু তার প্রয়োজন নাই, নিজেদের অস্ত্রকে এত ব্যর্থ মনে করিয়া দুঃখ করিও না—গুলিতেই আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি মরিলাম।

এই বলিয়া বাঘটা মরিল—মানুষটা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নর-শার্দ্দূল সংবাদের এইখানেই সমাপ্তি।

নির্ব্বাণ

রাজার আজ কয়েক দিন হইল বড়ই চিন্তা। দীর্ঘ জটাধারী এক নাগাসন্ন্যাসী কয় দিন আগে রাজপুরীতে আসিয়াছিলেন, রাজার বিশেষ অনুরোধে খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—রাজকুমার সিদ্ধার্থ শীঘ্রই সংসার ত্যাগ করিবেন। তিনি রাজা হইবেন না বটে তবে রাজাধিরাজের ন্যায় সম্মানিত হইবেন। দীর্ঘ জটাধারী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাজার চিন্তা যাইতেছে না। রাজকার্য্যে তাঁহার মন নাই, আহার-নিদ্রায় তিনি বীতরাগ—নির্জ্জনে বসিয়া কেবল চিন্তা করিতেছেন।

রাজপুত্রেরও মনের অবস্থা বড় সুবিধা নয়, এই অল্প বয়সেই সংসারটার ফাঁকি তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে বিধাতাপুরুষ কৌশলী ঘৃত-ব্যবসায়ী; সংসারে অতি অল্প পরিমাণ সুখের সঙ্গে প্রচুর মাত্রায় দুঃখ মিশাইয়া কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে ইহাকে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। অধিকাংশ লোকই ঠকিতেছে। সংসারকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া অবশেষে অজীর্ণ ও অম্লরোগে ভুগিতেছে। কিন্তু তাঁহার কাছে বিধাতার ভেজাল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রাজপুত্র ঠকিবার পাত্র নহেন। ছেলে বেলায় সেই আহত হাঁসটাকে দেখিয়া তাঁহার খট্‌কা লাগিয়াছিল বটে, তবে প্রাণীরা চিরজীবী নয়! আসলের পিছনে সুদের ন্যায় জীবনের পিছনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তারপরে কিছুদিন কথাটা ভুলিয়া ছিলেন। প্রথম যখন বিবাহ করিলেন—মনে হইল, তবে বোধ হয় তাঁহারই ভুল; সংসারটা সত্য সত্যই বুঝি বিশুদ্ধ গব্যঘৃত। কিন্তু

বেশিদিন এভাব থাকিল না, আবার দু-চারটি অধ্যাত্মিক উদ্গার উঠিল, রাজপুত্র বুঝিলেন—ইহাতে ভেজাল আছে।

বিশেষ, কয়েকদিন হইতে এই ভাবের বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে, পদে পদে সংসারের ফাঁকি চোখে পড়িতেছে। সেদিন বাগানে বেড়াইতে ছেলেবেলার মার্ব্বেল খেলিবার গর্ত্তটা চোখে পড়িল। অমনি তিনি ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কে বলিল, এতটুকু গর্ত্তে এতখানি নীতিতত্ত্ব নিহিত আছে? তাঁহার মনে হইল, সংসারটা এমনি শতশত নৈতিক অধঃপাতের কূপে পরিপূর্ণ। তবে যে শাস্ত্রে বলে গোষ্পদে মানুষ ডুবিয়া মরে তাহা একেবারে মিথ্যা নয়। আর একদিন তাঁহার শিকার করিবার ধনুকখানি চোখে পড়িল; তিনি শিহরিয়া উঠিলেন মনে হইল—তিনিও অমনি আসক্তির রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ইল্লিশ মৎস্যের মত বাঁকিয়া গিয়াছেন। মায়া পাশ ছিন্ন হইলেই সরল ভাব ধারণ করিবেন। শেষে এমন অবস্থা হইল, তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই একটা তত্ত্বকে মুর্ত্তিমান দেখিতে পান। ঢেঁকি, কুলা, ধামা, হাতা, খুন্তি, পিঁড়ি সকলের মধ্যেই নীতিকথা উগ্রভাবে প্রকাশিত। পৃথিবীটাকে তাঁহার সুবৃহৎ একখানা বোধোদয়ের মত বোধ হইল। দৃশ্য জগতের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; কিন্তু তাহাতে বিপদ আরো বেশী। অন্ধকারের মধ্যে শত শত শর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে বৈরাগ্যের পথে চোখ মারিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। রাজকুমার প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে একদিন তিনি পত্নীকে ফাঁকি দিয়া কিছু বেশি পরিমাণে সুধা পান করিলেন। নেশার ঝোঁকে তাঁহার মনে হইল, সংসারটা বেবাক মায়া; মনে হইল তাঁহার দুইখানা আধ্যাত্মিক ডানা গজাইয়াছে; ছাদের উপর

হইতে লাফ দিবার চেষ্টায় ছিলেন; লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সেদিনের ব্যাপার দেখিয়া পত্নী সুধার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া রাখিতেন। রাজপুত্র বুঝিলেন—ভেজাল, ভেজাল, সর্ব্বত্রই ভেজাল। সাধনার পথে নারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাধা। তিনি সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন—রথ প্রস্তুত কর; আমি নগর ভ্রমণে বাহির হইব।

২

পুত্র নগর ভ্রমণে বাহির হইবে শুনিয়া রাজা পরম আহ্লাদিত হইলেন, তবে বুঝি পুত্রের মতিগতি ফিরিল। তিনি তখনি নগরপালকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, রাজপুত্র যে পথে যাইবে সে পথে যেন দুঃখের কোন লেশ না থাকে। কোটালের যষ্ঠি জাদুকরের যষ্ঠি না হইলেও তাহার দ্বারা অকালে অস্থানে হাসি বিকশিত করিয়া তুলিতে সে অভ্যস্ত; এমন মাঝে মাঝে প্রায়ই করিতে হয়। নগরের পূর্ব্বগামী পথে হাসির ব্যবস্থা সে করিল। প্রত্যেককে পাচ 'দ্রম্ম' মুদ্রা দিবার অঙ্গীকার করিয়া হাজার জন লোক ভাড়া করা হইল, তাহারা পথের দুই পাশে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া রহিল। রাজপুত্র বাহির হইলেই হাসিতে আরম্ভ করিবে। পাছে তাহারা কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, সেজন্যে প্রত্যেকের পিছনে একজন করিয়া যষ্ঠিধারী প্রহরী মোতায়েন করা হইল! নিন্দুকেই শুধু বলিয়া থাকে যে, লাঠিতে কেবল কাঁদায়; প্রয়োজন হইলে লাঠির আঘাতে হাসানও চলে। সহরের সে অঞ্চল হইতে কাণা, খোঁড়া, দুঃখী, দুঃস্থদের তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

রাজপুত্র রথে বাহির হইয়াছেন ; হাজার জন 'দেখন-হাসি' হাজার জোড়া দন্ত-পঙক্তি বাহির করিয়া হাসিতেছে। তিনি এই বাধ্যতামূলক দন্ত-প্রদর্শনী দেখিয়া বুঝিলেন—জগৎ আনন্দময়। বিধাতা যে মানুষকে দাঁত দিয়াছেন, হাস্য করাই তার লক্ষ্য, রাজপুত্রকে দেখিলে হাস্য করাই তার উদ্দেশ্য, আহার করা নিতান্ত অবান্তর। কিন্তু সৌভাগ্যবশত রাজকীয় দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ নয়, নতুবা তিনি দেখিতে পাইতেন—মাঝে মাঝে প্রহরীর লাঠির গুঁতা পিঠে পড়িতেছে, এবং হতভাগ্য পৃষ্ঠের মালিক কাঁপিতে কাঁপিতে হাসিতেছে।

রাজপুত্র চলিয়াছেন, কোথাও কোন বৈকল্য নাই, কেবল হাসি, গান, বাঁশী, হাসি আর হাসি! এমন সময়ে—ওকে? ও কি? পথের প্রান্তে ও লোকটা কে? এই হাসির ধ্রুপদের মধ্যে তাল কাটিয়া ও লোকটা কে প্রবেশ করিল? রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি ওই লোকটা কে? ও কেন হাসির ঐক্যতানে যোগ দেয় নাই? দৃষ্টি উদাস, গতি উদাসীন, মুখ আসক্তিহীন, বেশ ম্লান. কিন্তু একদা যেন সৌখিন ছিল,—ও লোকটা কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, ও লোকটা বেকার?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি? উহা ওর বংশগত, না সকলেরই হইতে পারে?

সারথি বলিল—সত্য কথা বলিতে কি কুমার, উহা ওর জন্মগত নয়, সকলেরই এমন অবস্থা হইতে পারে। রাজার ঘরে না জন্মিলে আপনিও বেকার হইতেন, আবার আপনি যদি নিজেই রথ হাঁকাইতে শেখেন তবে আমাকেও বেকার হইতে হইবে!

তিনি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেকার—কি করিলে হয় ?

সারথি বলিল—তার চেয়ে বলুন কি না করিলে হয় ? লোকটাকে আমি চিনি। গৌতমের চতুষ্পাঠির ছিল সেরা ছাত্র। ওরকম মেধাবী ছাত্র এ অঞ্চলে ছিল না। গৌতমের নীবার ধান্যের ক্ষেতে আগ্রহাতিশয্যে এত বেশী জল সেচন করিয়াছিল যে, অবশেষে ধানে পোকা লাগিয়া গিয়াছিল। তবু গৌতমমুনি ওর উপরে রাগ করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরীক্ষায় ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখন বৃত্তিহীন ! তাই ওর এই দশা।

রাজপুত্র—এই বেকারের পরিণাম কি ?

সারথি—হয় ত রাজদ্রোহ করিবে, নয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, নয় বিবাহ করিবে।

রাজপুত্র বলিলেন—সংসারে ধিক্ ! সারথি, রথ ফিরাও।

বিবেক-বিদ্ধ রাজপুত্র ফিরিয়া আসিলেন—রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল।

পাছে রাজপুত্র সংসার ত্যাগ করে সেই জন্য স্নেহময়, কর্ত্তব্য পরায়ণ, পুত্রের মঙ্গলকামী পিতা বাছা বাছা নটী আমদানি করিলেন—তাহারা সর্ব্বদা রাজপুত্রকে ঘিরিয়া থাকিবে। সৌন্দর্য্য, যৌবন ও বিলাসের প্রাচীরে এতটুকুও ফাটল না থাকে—যাহার ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের শীতবায়ু প্রবেশ করিতে পায়।

৩

রাজপুত্র পরদিন আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। নগরের পশ্চিম দিকের পথটাকে ভাল করিয়া সাজান হইল; আগের দিনের চেয়ে কড়া পাহারা বসিল, যেন অবাঞ্ছিত কেহ না আসিয়া পড়িতে পারে। পথের দুই ধারে দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীদের দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল; তাহারা বিচিত্র বসনে-ভূষণে সজ্জিত হইয়া মুর্ত্তিমান বিজ্ঞাপনের মত শোভা পাইতে লাগিল।

যথাসময়ে রথে করিয়া রাজকুমার বাহির হইলেন; যেদিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করুন না, কেবল ঐশ্বর্য্য সম্পদ সৌন্দর্য্য। পূর্ব্বদিনের আকস্মিক অভিজ্ঞতা প্রায় ভুলিয়া গেলেন তিনি সারথির দিকে তাকাইয়া মুগ্ধভাবে বলিলেন—সারথি, সংসার কত সুখের! তবে যে মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে দারিদ্র্যের কথা পড়ি, সেটা বুঝি উপন্যাস।

এমন সময় পথের এক পাশে—ও লোকটা কে? মুখে চোখে চকিত ভাব; গতি সন্ত্রস্ত, ব্যাঘ্রপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে মৃগশিশুর মত ভীত তাহার অবস্থা; খোলা ছাতি এদিকে ওদিকে মেলিয়া সর্ব্বদাই যেন নিজেকে আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছে? লোকটা কে? এই ঐশ্বর্য্যের মহাকাব্যের মধ্যে লোকটাকে একটা মারাত্মক ছাপার ভুলের মত দেখাইতেছে, তাই তো লোকটা কে?

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি, লোকটা কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, লোকটা ঋণী!

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—ঋণ কাহাকে বলে?

সারথি—শোধ করিরার ইচ্ছা না থাকিলেও শোধ করিবার অঙ্গীকার করিয়া টাকা লওয়াকে ঋণ বলে।

বিস্মিত রাজপুত্র জানিতে চাহিলেন,—আমাদের কি ঋণ আছে?

সারথি—রাজপুত্র, রাজাদের ঋণের নাম জাতীয় ঋণ। যে রাজার রাজ্য ও জাতীয় ঋণ যুগপৎ না বাড়িতে থাকে সে রাজাই নয়!

রাজপুত্র—এখন ইহার পরিণাম কি?

সারথি—হয় জেল, নয় উন্মাদাগার, নয় সাহিত্যসেবা।

রাজপুত্র গম্ভীর হইয়া আদেশ করিলেন—রথ ফিরাও।

আগের দিনের ও আজিকার যুগল অভিজ্ঞতা মিলিয়া তাঁহার মানসাকাশের অর্দ্ধেক যেন অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

মর্ম্মাহত পিতা খবর শুনিয়া নটীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন।

৪

পরদিন রাজপুত্র নগরের উত্তরগামী পথে ভ্রমণে বাহির হইলেন; পথের দুইদিকে সুন্দর দেহধারী সুপুরুষগণ দণ্ডায়মান; রাজপুত্র দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন,—সংসারে সুখ না থাকুক—স্বাস্থ্য আছে, প্রফুল্লতা আছে, যাহা হোক, মন্দর ভাল। এমন সময়ে ফিরিবার মুখে দেখিতে পাইলেন, একজন মানুষ, প্রায় তাহাকে অমানুষ বলিলেই চলে।

বলিচিহ্নিত কপাল, শুষ্কগণ্ড, কোটরগত চক্ষু, শীর্ণঅধর, আধ-পাকা দাড়ি, কেবল উদ্ধত নাকটা একটা উগ্র জয়ধ্বনির মত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে! ক্ষীণ দেহ, পদে পদে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে উদ্যত।

ভীত রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি, ওই প্রেতোপম লোকটি কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, লোকটা কেরাণী।

রাজপুত্র—কেরাণী কাহাকে বলে?

সারথি—যাহার আত্মহত্যার নাম চাকুরী।

রাজপুত্র—লোকটাকে প্রায় অন্ধ বলিয়া মনে হইতেছে; কি করিয়া হইল?

সারথি—টাকার হিসাব রাখিতে রাখিতে।

রাজপুত্র—তাহার এতই যদি টাকা তবে এ দুর্দ্দশা কেন?

সারথি—টাকা ওর নিজের নয়।

রাজপুত্র—তবে কাহার?

সারথি—কাহার, তা আমিও জানি না—ও লোকটাও জানে না—কাহার টাকা, কিসের টাকা, কেন রাখা হইতেছে, কবে কি প্রকারে খরচ হইবে—উহার তাহা জানিবার উপায় নাই, ও কেবল অন্ধকার বদ্ধ ঘরে বসিয়া অঙ্কের পরে অঙ্ক পাত করিয়া গণনা করিয়া যাইতেছে; গণনা করিতে করিতে চক্ষু অন্ধ, স্বাস্থ্য নষ্ট, মন নিরানন্দ হইতেছে, অবশেষে হয় তো একদিন টাকার গাদার উপরে পেটের ক্ষুধা লইয়া হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পড়িয়া মরিবে। উহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজন ওখানে আসিয়া বসিবে। ইহাই ইহার জীবনের—কিম্বা সত্য-কথা বলিতে কি—মরণের ইতিহাস।

রাজপুত্র—তবে শুনিয়াছি, আইনের চক্ষে সকলেই সমান আইন উহাকে রক্ষা করে না কেন?

সারথি—সমান বলিয়াই তো রাজার এবং ওই লোকটার দুইজনেরই

ভিক্ষা করা নিষেধ; ফুটপাতে শুইয়া থাকা নিষেধ; আত্মহত্যা করা নিষেধ।

রাজপুত্র নীরব রহিলেন। সারথি বলিয়া যাইতে লাগিল—যেন রাজা সর্ব্বদাই ভিক্ষা করিতে উদ্যত—কেবল আইনের ভয়ে পারিতেছেন না, যেন ফুটপাতে না শুইলে তাহার ঘুম আসে না, অথচ আইন বাদী; যেন আত্মহত্যা ছাড়া তাঁহার দুঃখের হাত হইতে মুক্তি নাই—কিন্তু ন্যায়ের দণ্ড উত্থিত।

রাজপুত্র বলিলেন—সংসারে ধিক্, রথ ফিরাও।

৫

রাজপুত্র সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন—সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই কেবল বেকার ঋণী ও কেরাণীতে পূর্ণ। জীবনের ইহাই তো পরিণাম তবে এ সংসার ত্যাগ করা ভাল কিন্তু ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, কোন নূতন জীবনকে তিনি গ্রহণ করিবেন? সারা রাত্রি জাগিয়া এই চিন্তা তিনি করিয়াছেন।

পরদিন পুনরায় তিনি নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন—এবার দক্ষিণগামী পথে। আগের তিন দিন পথ-সজ্জায় প্রচুর খরচ হইয়াছে অথচ সে-পরিমাণে ফল হয় নাই দেখিয়া এবার আর পথ সাজানো হয় নাই। তবে স্বভাবতই নগরের দক্ষিণ অঞ্চল সুসজ্জিত। রাজপুত্র সংসারের ভাল-মন্দ যাহা কিছু দৃশ্য দেখিতে চলিলেন। তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল

—সংসার ত্যাগ করিতেই হইবে—কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কোন আশ্রমকে গ্রহণ করা উচিত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিয়াই তাঁহার সংসার ত্যাগ করা হইতেছে না।

এমন সময়ে অদূরে—ওই কে যায়? তিনি চমকিয়া উঠিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি ও লোকটা কে? মুখে হাসি, চোখে চশমা, মাথায় কেশদাম ও সীঁথি, গালে পাউডার ও অধরে সিগারেট, স্কন্ধে ভূলুণ্ঠিত চাদর, কোঁচায় যেন ধূলা ঝাট দিতেছে, জুতা জোড়া এত উজ্জ্বল যেন মুখ দেখা যায়, আর দুই পাশে তাহার অনুরূপ তরুণীগণ নানা বাদ্যযন্ত্র বহন করিতেছে কাহারো কাহারো হাতে সুধার পাত্র। ওই লোকটা কে? দেয়ালে দেয়ালে 'ওই যে বিভিন্ন অবস্থার চিত্র উহা যেন ইহারই, চিরযৌবনরূপী এই লোকটি কি কন্দর্প?

সারথি বলিল—না রাজপুত্র, লোকটা ফিল্মষ্টার।

রাজপুত্র যেন আপন মনেই বলিলেন—কে বলিল—সংসারে সুখ নাই। এতদিন পরে রাজপুত্র যেন সুখের সন্ধান পাইয়াছেন।

সারথি বলিল—রাজপুত্র, সিনেমা অ্যাক্টরই আজকাল সমাজের আদর্শ। ছেলেরা উহারই মত করিয়া বই পড়িতেছে না, যুবারা উহারই মত করিয়া জামা পরিতেছে, মেয়েরা সিনেমা-অভিনেত্রীদের মত করিয়া বস্ত্র পরিতেছে অর্থাৎ প্রায় না-পারিতেছে, সেই রকম করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে, সেইরূপ—

'ঘর কৈনু বাহির,
বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর'

আদর্শকে পালন করিতেছে। উহারাই এ যুগের অবতার। এ জীবনে দুঃখ নাই, জরা নাই, বার্দ্ধক্য নাই, শোক নাই, ঋণ নাই, স্বাধীনতার খর্ব্বতা নাই, ইচ্ছার প্রতিরোধ নাই, বোধ হয় মৃত্যুও নাই। কেবল হাসি, বাঁশী, গান, যৌবন, বসন্ত আর বঁধু, কেবল সখা আর সখী, তুমি আর আমি, আর কেবল—তা তা থৈ থৈ।

সারথির বর্ণনা শুনিয়া রাজপুত্রের একবার সন্দেহ হইল—সে বোধহয় সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে। রাজপুত্রের মনে হইল যে, এতদিনে দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্তির একটা উপায় পাওয়া গেল।

রাজপুত্র বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শুনিলেন, তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আবার বন্ধন !

সেইদিন গভীর রাত্রে রাজপুত্র একাকী সংসার ত্যাগ করিলেন; সকলে ভাবিল রাজপুত্র কোথায় গিয়াছেন! তিনি সোজা দক্ষিণ-অঞ্চলের পবিত্রারণ্য নামক সিনেমা কোম্পানীতে গিয়া যোগ দিলেন। এখনো তিনি নাম ভাঁড়াইয়া সিনেমায় অভিনয় করিতেছেন। এখন তিনি একজন বিখ্যাত ষ্টার কিন্তু মনে কি শান্তি পাইয়াছেন? নিকটবর্ত্তী সিনেমা অভিনেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

জি-বি-এস্
ও
প্র-না-বি

আমি সংবাপত্রের রিপোর্টার। সে-সংবাদপত্র দেশ চালায়, আমি তাহাকে চালাই, অতএব কম লোক নই। পুরাণে আছে দধীচি মুনি অস্থি দিয়াছিলেন, তাহাতে বজ্র গড়িয়া ইন্দ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অনেক দৈত্য মরিয়াছিল। এখন, কোন্ পাহাড়ে হয় বাঁশ, তারা দিতেছে মর্ম্মাস্থি, টিটাগড় কাগজের কলে স্থুলভবজ্র গড়া হইতেছে, কিন্তু এবার আর দৈত্য মরে না, কারণ তাহারাই এই বজ্রের নিক্ষেপক। আমরা প্রত্যহ সকালে (সোমবার ছাড়া) সংবাদপত্রের বজ্র দেশময় নিক্ষেপ করিতেছি, আর কত নিরীহদের বিবাহ ভাঙিতেছে, কত বন্ধুর প্রণয় ভাঙিতেছে, কখনও দেশের লোক কাঁদিতেছে, কখনও ক্ষেপিতেছে। আমরা বড় কম লোক নই। ওদিকে পাহাড়ে বাঁশের বন ধ্বংস হইতেছে, বৃষ্টিতে পাহাড় ধ্বসিয়া নদী-নালা বন্ধ হইতেছে, সারা দেশ অনুর্ব্বর হইতেছে। আর এদিকে মানুষের মন সেই বাঁশের প্রেতাত্মার তাড়নে ক্ষিপ্ত, মত্ত, শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। বাঁশ, মরিয়াও একি তোমার প্রতিশোধ!

কিন্তু সম্প্রতি মুস্কিলে পড়িয়াছি। আমরা সবাই অবশ্য ইংরেজী কাগজ হইতে অনুবাদ করিয়া খবর ছাপাই, তবে গোলদীঘির সহযোগী কাগজ কিনিয়া অনুবাদ করে, একটু তাড়াতাড়ি হয়; আমরা কাগজ চাহিয়া লইয়া অনুবাদ করি, দেরী হইয়া যায়; পিছাইয়া পড়িতেছি। সম্পাদক মহাশয় তাড়া দিতেছেন।

তাহা ছাড়া, এত নূতন খবর পাইবই বা কোথায়? একদিনের বাসি খবর পাঠকদের আর রুচে না। এত যুদ্ধ, এত বিমানধ্বংস, এত আত্মহত্যা পাই কোথায়? সত্য কথা বলিতে কি পৃথিবীর লোকের আত্মবিসর্জ্জনের ভাব তেমন আর যেন উগ্র নয়। এখন ভরসা ইউরোপের গোটা চার পাঁচ ডিক্টেটার; তাঁহারাই এখন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধবিগ্রহ বাধাইয়া সংবাদপত্রের প্রেষ্টিজ রক্ষা করিতে পারেন। আমরা ভারতীয়েরা খবরের কাগজ পড়িবার জন্যই জন্মিয়াছি, তাহাতেও ইউরোপ বাদ সাধিলে নাচার।

আমি কম লোক নই, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় আমার চেয়েও বড়, তাঁহার কড়া হুকুম নূতন সংবাদ চাই।

কি করি। একবার ভাবিতেছি একটা রিপোর্ট আগেই লিখিয়া রাখিয়া লেকের জলে ডুবিয়া মরি। কিন্তু সে সংবাদ যে ছাপা হইবে তাহা কেমন করিয়া জানিব! অতএব ভাবিতেছি,—মাকড়সা যেমন করিয়া নিজের রস দিয়া জাল বুনিয়া তুলে, তেমনই করিয়া চিন্তা-রসের দ্বারা সংবাদ বয়ন করিব। কবির আশ্বাস মনে পড়িল—"ঘটে যা তা সত্য নহে, যা ভাবিবে সেই সত্য—"

চিন্তার আবেগে সংবাদ আসিল না, ঘুম আসিল।

* * *

কে যেন পিঠের উপরে হাত রাখিয়াছে, ধাক্কা দিতেছে! ফিরিয়া দেখি এক সাহেব। চমকিয়া উঠিলাম, সাহেবকে দূরে দেখাই অভ্যাস, একেবারে এত কাছে? দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণ; চুল অল্প, দাড়ি বিস্তর, দুই-ই সাদা; চোখের ভুরু-জোড়া কপালের প্রান্তে উপরেরদিকে বাঁকানো;

নাকটা ঘুষির মত উত্থিত ; মুখে অদ্ভুত হাসি ; লোকটা যেন হাসি দিয়াই পৃথিবীকে দেখে—চোখ দিয়া নয়।

সংবাদপত্রের লোকের মনে প্রথমে যেকথা আসে তাহাই আসিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, পুলিশের লোক ?

সাহেব বলিল, আন্তর্জ্জাতিক পুলিস। আমার লেখা পড় নাই।

বুঝিলাম সাহেব এদেশে নবাগত ; কারণ আমরা লিখি বটে, কিন্তু পড়ি এ অপবাদ স্বয়ং পুলিসেও দেয় না। আমার মনের ভয়ও ভাঙিয়া গেল, সাহেব লেখে ! সে আবার কি কথা ? এ দেশে কোন সাহেবকে কথনও লিখিতে তো শুনি নাই !

সাহেব আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিল, আমিও সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিলাম।

এখন ?

এখন নাটক লিখি।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, সাহেব আমার চেয়েও দুর্দ্দশাগ্রস্থ। একটা প্রকৃতিস্থ লোক কতখানি বিপন্ন হইলে তবে নাটক লিখিতে সুরু করে। হঠাৎ তাহার পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়িল ; এতক্ষণে সব পরিষ্কার হইল, সাহেব নিশ্চয় Alms House-এর সভ্য !

সে বলিল, আমার সঙ্গে এস, নূতন খবর যদি চাও।—বলিয়া সে হিড়হিড় করিয়া আমাকে টানিতে আরম্ভ করিল।

ইস, কি কড়া হাত !

এক সময়ে ঘুষি-খেলার অভ্যাস ছিল।

এখন ?

প্রয়োজন হইলে এখনও পারি।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সাহেবের অনুসরণ করিলাম।

*　　　*　　　*

একটা আদালতের মত বাড়ির সম্মুখে বড় ভিড়; ঢুকিয়া দেখি আদালতই বটে, বিচার চলিতেছে। উঁচু আসনে বিচারক বসিয়া ঘুমাইতেছে। পাশেই পেস্কার নীচু একটা চেয়ারে বসিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে, বোধ হয় ইষ্টনাম জপিতেছে। আসামীর কাঠগড়ায় জীর্ণ শীর্ণ ভিক্ষুকজাতীয় একটা লোক, পরে বুঝিলাম ভিক্ষুকই বটে।

আসামীর উকিল বলিতেছে, হুজুর, আমার মক্কেল অতিশয় নিরীহ, সাধু-সচ্চরিত্র লোক, সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই। সমাজের কোন হানি সে করে নাই, অন্যের ধনের প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, রাষ্ট্রের আইন সে ভঙ্গ করে না। সমাজের আইন সে মানিয়া চলে। সে চোর নয়, বদমায়েস নয়, বিপ্লবী নয়, দাগী নয়, এমন কি সাহিত্যিকও নয়, সামান্য একজন ভিখারী মাত্র। দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র অপরাধ, কিন্তু সে অপরাধের জন্য দায়ী কে? আর যে-ই হউক, আমার মক্কেল নয়।

সরকার পক্ষের উকিল আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, হুজুর দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড় অপরাধ; অন্য সব অপরাধের মূল দারিদ্র্যে! দারিদ্র্যের জন্যই চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, আত্মহত্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সামাজিক অশান্তি; দারিদ্র্যের জন্যই রোগ এবং রোগের বিস্তার; এমন কি সাহিত্যের মূলও দারিদ্র্যে।

আসামী পক্ষের উকিল একবার মুখ খুলিয়াছিল, কিন্তু সরকারী উকিলের বাক্যের নায়েগ্রা তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, হুজুর একবার শুনুন—

বিচারক মাথা তুলিয়া বলিলেন, তুমি কি ভাব আমি ঘুমাইতেছি? অত চীৎকার না করিয়া ধীরে কথা বল। সে আবার টেবিলে মাথা রাখিয়া নিদ্রার ভঙ্গিতে বোধ হয় সব শুনিতে লাগিল।

সরকারী উকিল গর্জ্জিয়া চলিল, হুজুর, দারিদ্র্যই মানুষের original sin; দারিদ্র্যই জীবনে মৃত্যু, দেবতা ও মানবের ভেদ ওই দারিদ্র্যের তারতম্য। স্বর্গের ঐশ্বর্য্য সরাইয়া লইলে কালই দেবতারা এ উহার পকেট কাটিতে সুরু করিবে। আবার দরিদ্রকে ঐশ্বর্য্য দিন, সে আপনার, আমার মত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত নাগরিক হইয়া উঠিবে। নিখিল পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্যই সমাজকে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে পলে পলে নীচের দিকে টানিতেছে, রোগের দিকে, কুশিক্ষার দিকে, অপরাধের দিকে, দুরাতিক্রম্য মৃত্যুর দিকে। গ্রীক-সভ্যতার ধ্বংসের মূলে গ্রীক সমাজের ক্রীতদাস সম্প্রদায় ও তাহাদের দারিদ্র্য; রোমক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মূলও ওই একই স্থানে।

আসামীর উকিল বলিল, আমার বন্ধু যদি সাম্যবাদী হন, তবে ধন-বিভাগ করিয়া আমার মক্কেলের সঙ্গে সমান হন না কেন?

বাদীপক্ষের উকিল বলিল, আমি কেন তাহার সমান হইতে যাইব? বরঞ্চ সে আসিয়া আমার সমান হউক, আপত্তি কি! আমি তাহার সমান হইলে পৃথিবীতে আর একটি দরিদ্র বাড়িবে, সে আমার সমকক্ষ হইলে জগতে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাড়িবে!

আসামীর উকিল বলিল, শুধু সম্ভ্রান্ত নাগরিক নয়, একজন উকিলও বটে।

আমরা দুই জন দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। সাহেব বলিল, ইহারা

আমার নাটক পড়িয়াছে দেখিতেছি, তোমাদের দেশে আমার নাটক হয়?

আমি বলিলাম, আমরা এখনও বঙ্গে বর্গী, আলিবাবা, মোগল-পাঠানের যুগে আছি। ইংরেজী নাটক করিবার ফুরসৎ আমাদের কোথায়?

আসামীর উকিল বলিতে লাগিল, হুজুর, হইতে পারে যে দারিদ্র্য অশেষ দোষের কারণ,—কিন্তু সেজন্য আমার মক্কেল দায়ী নয়—কারণ দারিদ্র্য ও দরিদ্র ব্যক্তি এক নয়!

বাদীপক্ষের উকিল বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ধর্ম্মাবতার,—দারিদ্র্য এক প্রকার ব্যাধি এবং বিশেষ ছোঁয়াচে ব্যাধি। দারিদ্র্য ও দরিদ্রে ভেদ করিব কি উপায়ে—? দরিদ্রকে ছাড়িয়া দারিদ্র্য কোথায় পাওয়া যায়? ছোঁয়াচে ব্যাধি হইলে রোগীকে, সে রোগী যতই প্রিয়পাত্র হউক না কেন, যেমন স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয়, দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা তাহার বিষস্পর্শে সমাজ বিষাক্ত, কলুষিত, বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে। অতএব আমি প্রার্থনা করি, সমাজের নামে, রাষ্ট্রের নামে, সমগ্র মানব জাতির নামে, এই ব্যক্তির উপরে আইনের চরম দণ্ড দান করিয়া সুবিচার করা হউক।

বিচারক মাথা তুলিয়া বলিল, আপনারা ভাবিবেন না আমি ঘুমাইতেছিলাম। গভীর চিন্তা ও গভীর নিদ্রার বাহ্যিক লক্ষণ এক রকম; আমি চিন্তা করিতেছিলাম মাত্র। পেস্কার বাবু—

পেস্কার বলিল, হুজুর ভাবিবেন না, আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলাম। ইষ্টমন্ত্র জপ ও আইনের উপধারাগুলির আলোচনা বাহ্যত একই রকম দৃষ্ট হয়; আমি উপধারা গুলির আলোচনা করিতেছিলাম মাত্র।

বিচারক রায় লিখিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে রায় পড়িল,

দারিদ্র্যাপরাধ নিবন্ধন এই ব্যক্তিকে পঁচিশ ঘা বেত মারা হউক, এবং এক বৎসর পরে এই ব্যক্তি যদি মাসিক একশত মুদ্রা আয় না দেখাইতে পারে, তবে ইহাকে পুনরায় আদালতে উপস্থিত করা হউক।

রায় শুনিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ কোথায় আসিলাম! ইহা কি সনাতন ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষে দারিদ্র্য তো দোষের নয়, বরঞ্চ সে দেশে কে কত দরিদ্র হইতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা চলিতেছে! সাহেবটি মোটেই বিস্মিত হয় নাই,—সে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল চল অন্যত্র যাওয়া যাক।

একটা বাড়ীর সম্মুখে ভিড় জমিয়াছে। বাড়ীর দরজা আলো ও ফুলে সাজানো। আমরা দুইজনে ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, বোধহয় কাহারও জয়ন্তী হইতেছে।

সে বলিল, সে আবার কি?

আমি বলিলাম,—দেখ তোমরা যতই সভ্য বলিয়া গর্ব্ব কর না কেন, এখনও কোন কোন বিষয়ে পিছাইয়া আছ। জয়ন্তী মানে বড়লোকের সম্বর্দ্ধনা।

—সে তো মরিবার পরে করে।

আমি বলিলাম, আমরা মরিবার পরে মনে রাখিনা, তাই আগেই করি!

সভায় ঢুকিয়া দেখি, মঞ্চের উপরে এক প্রবীণ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত সভাপতি, গলায় গলকম্বলের মত একরাশি মালা। আর পাশেই একটা লোক। কিন্তু লোকটা কে? কানে বিড়ি গোঁজা; চোখ দুটা লাল,

চুল রুক্ষ, রোমাঞ্চিত দাড়ি ; গায়ে অজানুলম্বিত সূক্ষ্ম পাঞ্জাবী, পরণে বোধ হয় লুঙ্গিই। ওই লোকটারই কি সম্বর্দ্ধনা !

সভাপতি উঠিয়া সভ্যদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বন্ধুগণ, আজ আপনারা এই মহাত্মার সম্বর্দ্ধনার জন্য সমবেত। ইনি এত স্বনাম ধন্য যে ইঁহার—পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। রজত-জয়ন্তীর কমিটির সম্পাদক একখানি মানপত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে মহিলাগণ একটি সঙ্গীত করিবেন।

সভাপতি মহাশয় চেয়ার গ্রহণ করিলে মহিলাগণ গান ধরিলেন—

বাতায়ন পথে যাতায়াত তব,
নহ তুমি নহ সমীরণ,
তস্কর বলে নিন্দুক যত
মনোচোর বলে কবিগণ।
তোমার পরশে খোলে সিন্দুক
(পরের ছত্রটি গোলমালে বুঝিতে পারিলাম না।)
হাতুড়ির ঘায়ে ভাঙো অর্গল
সারানিশি করি জাগরণ।

সঙ্গীত ও করতালি থামিলে সম্পাদক মহাশয় কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া মানপত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

মহাত্মন্,

তোমাকে আমি সমগ্র জাতির নামে আদরে আহ্বান করিতেছি। তুমি যুগপৎ জাতির রুদ্ধচিত্ত ও বদ্ধতালা খুলিয়াছ ; তুমি যুগপৎ জাতির হৃদয়মন্দিরে ও ধনভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ, তুমি যুগপৎ বাতায়ন ও দ্বারপথে প্রবেশ করিতে পার,—তুমিই ধন্য।

হে দেব,

দারিদ্র্যকে আমরা ঘৃণা করি; ঐশ্বর্য্য আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। নিরীহভাবে দরিদ্র হইবার অপেক্ষা উগ্রভাবে তস্করবৃত্তিও শ্রেয়।

হে বীর,

দারিদ্র্য প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে টানিতেছে—তুমি সেই সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুকে এড়াইবার জন্য যে-বৃত্তিকে বরণ করিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় বীরের যোগ্য বটে। তুমি একাধারে মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয়।

হে আদর্শবাদী,

আদর্শের জন্য যাহারা দুঃখবরণ করিয়াছে, তুমি তাহাদের অন্যতম। মানুষের জীবন ফুটপাত ও কারাগারের মধ্যে দোদুল্যমান; তুমি যুগপৎ এই দুইকেই জয় করিয়াছ। তোমার হস্ত চুম্বক হইতেও প্রবল, কারণ তাহা স্বর্ণ ও রজতকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তোমারই রজত-জয়ন্তী সার্থক।

হে ভাগ্যবান্,

সার্থক চৌর্য্যেরই নাম বীরত্ব। তুমি তস্করবৃত্তিতে ধরা পড়িয়া কারাগারে গেলে তোমাকে ঘৃণা করিতাম। কিন্তু যেহেতু তুমি নৈশ-অধ্যবসায়ে জানালার শিক ভাঙিয়া, সিন্দুকের তালা ভাঙিয়া মালিকের মাথা ভাঙ্গিয়া ও পুলিশের আইন ভাঙিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছ, কাজেই তুমি বীর, তুমি বীরোত্তম!

হে তস্করর্ষি,

তোমাকে রজত-জয়ন্তী সভার পক্ষ হইতে একটি সামান্য উপহার দিতেছি, কিন্তু ইহার প্রভাব সামান্য না হইতেও পারে। ভারতীয় সিঁধকাঠি অতি প্রাগৈতিহাসিক ধরণে প্রস্তুত; বৈজ্ঞানিক-যুগে তাহা প্রায়

অচল ; ইউরোপের কাছে এই আদিম সিঁধকাঠির জন্য আমরা মাথা নত করিয়া আছি। তোমাকে আমরা ইউরোপীয় ধরণে রচিত সিঁধকাঠি উপহার দিতেছি। ইহার শক্তি প্রায় অলৌকিক, ইহার লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না, ইহা নানা নামে প্রখ্যাত। ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স, ডিরেক্ট ও ইন্‌ডিরেক্ট ট্যাক্সেশন্, কাষ্টম্‌স ডিউটি, হোমচার্জ, সুপার ট্যাক্স, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড, শিলিং রেশিও, টেরিফওয়াল, অটোয়া চুক্তি প্রভৃতি অসংখ্য ইহার নাম ! হে প্রভু তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদের কলঙ্ক দূর কর।

সম্পাদক মহাশয় মানপত্র পাঠ শেষ করিয়া একটি ভেল্‌ভেটের কৌটায় ভরা সিঁধকাঠি লোকটির হাতে দিলেন। করতালিতে কানে তালা লাগিয়া গেল।

সভাপতির আদেশে মহিলাগণ পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত থামিলে দেখা গেল লোকটি নাই। খোঁজ পড়িয়া গেল। এদিকে সভাপতি দেখিলেন তাঁহার পকেটের নিম্নার্দ্ধ নাই, সম্পাদকের আণ্ডার-ওয়ারের পকেটটিও অন্তর্হিত ; তখন 'ধর ধর' রব পড়িয়া গেল।

এতক্ষণ আমাদের কেহ লক্ষ্য করে নাই, এইবার অনেকে তাকাইতে লাগিল। সাহেব বলিল, গতিক ভাল নয়, বাইরে চল।

বাহিরে আসিলাম। সাহেব বলিল, সবাই যেরূপ তাকাইতেছে, মার-ধর করিতে পারে, চল।

আমি বলিলাম আমাদের কি হাত নাই ?

সে বলিল পা-ও-তো আছে।

বেশ, লাথিই মারিব।

সে বলিল, নির্ব্বোধ, লাথি মারিবে কেন ? পালাও।

আমি বলিলাম, পলাইবার চেয়ে সত্য কথা বলিব।

সাহেব হাসিয়া উঠিল, মুর্খ, সত্য কথা বলিয়া জগতে কেহ স্বস্তি পাইয়াছে? সে আশা ছাড়।

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, তা বটে তোমরা তো একবার যীশুকে সত্যবাদিতার জন্যে পেরেক ঠুকিয়া মারিয়াছিলে। বোধ হয় এবার আসিলে আবার মারিবে।

সাহেব বলিল, না, যীশুর আর ভয় নাই। লোকটা বেশ নাম করিয়াছে। এবার আসিলে সে 'নাইটেড' হইতে পারে। সার্ যীসাস ক্রাইষ্ট। মন্দ শোনায় না! আমরা প্রথমে লোককে দণ্ড দিয়া দমাইয়া দিতে চেষ্টা করি, শেষে যখন তাহার খ্যাতি আর চাপিয়া রাখা যায় না তখন 'নাইটেড' করিয়া ফেলি। সত্য কথা কি যীশুর খ্যাতি এখন আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে, এবার আসিলে সে 'নাইটেড' কেন পীয়ার-ও হইতে পারে। ব্যারন অব বেথেলহাম! কেমন শুনাইতেছে?

কয়েকটা লোক আমাদের দিকেই আসিতেছিল; তাহা দেখিয়া সাহেব লম্বা পা ফেলিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল; আমি ক্ষুদ্র শক্তিতে ছুটিলাম। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সাহেবের নামটি তো জানা হয় নাই; চীৎকার করিয়া বলিলাম, সাহেব তোমার নামটি তো বলিলে না? দেখিতে পাইলাম, সাহেব একখানি কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। আর বলিল, আজকার বর্ণনাটা তোমাদের কাগজে লিখিও; আর কিছু না হউক নূতন হইবে। কাছে গিয়া কার্ডখানা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে—জর্জ বার্নার্ড শ!

বাগ্‌দত্তা

রাণুর সঙ্গে রজত রায়ের আজ তিন মাস ধরিয়া পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছে, কিন্তু কিছু সুবিধা হইতেছে না। উভয় পক্ষ ধনী, বিবাহে কোন বাধা নাই, তবুও। রজত ইতিমধ্যে তিন বার মোটর ও চার বার বাসা বদল করিয়াছে, সাধনা অদম্য উৎসাহে চলিয়াছে, সিদ্ধির দিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আসল কথা, প্রত্যেকের একটি করিয়া মর্ম্মস্থান আছে, সেখানে হাত না-পড়া পর্য্যন্ত সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই মর্ম্ম এত অবারিত যে হাত দিতেই সেখানে পড়ে। দু-এক জনের মর্ম্ম সত্যই রহস্যময়, আমাদের রাণু সেই দলের। রজত কি ছাই এত কথা বোঝে, না তাহার ভাবিবার সময় আছে! সে নিয়ত আসে যায়, রাণুর সঙ্গে গল্প করে, গান শোনে, চা খায়; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মুখ গম্ভীর করিয়া মোটর হাঁকাইয়া বাড়ী ফেরে। অবশেষে উভয় পক্ষের কর্ত্তারা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রজতের ব্যারিষ্টার পিতা তাহাকে শুভবিবাহের এক মাসের নোটিশ দিলেন। শুনিয়া রজত তৃতীয়তম মোটর হাঁকাইয়া রাণুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণুর কাছে খবর গেল। রজত বসিয়া টেবিলের বই লইয়া নাড়িতে লাগিল। হাঁ, একটা কথা অনাবশ্যক মনে করিয়া বলি নাই, বিশেষ, শুনিলে হয়ত রাণুর উপরে পাঠকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতে পারে, এমন কথাও মনে হইয়াছিল। কিন্তু আর গোপন

করিয়া ফল নাই, রজতের হাতে এখনই তাহা ধরা পড়িবে। রাণু মহাভারত পড়ে পয়ারেবাঁধা খাস কাশীদাসী গ্রন্থ।

বই নাড়িতে নাড়িতে রজত একখানি কাশীদাসী মহাভারত আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বহু অধ্যয়নের চিহ্ন তাহার মার্জ্জিনে। তাহাতে ছোট বয়সের মোটা অক্ষর ও বড় বয়সের ছোট অক্ষর সবই আছে। সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ দেখিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পাতায় লেখা আছে, "উঃ, অর্জ্জুন কত বড় বীর! নিশ্চয় অনেক বাঘ সে মারিয়াছে।" আবার, আর এক পাতায় ভীমের বক রাক্ষস বধের ছবির তলায়,—"ভীম না জানি কত বাঘ মারিয়া ফেলিয়াছে।" এক, দুই, তিন! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে রজতরঞ্জনের মনে একটা দিব্যদৃষ্টির বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! এমন দিব্যদৃষ্টি লাভ জীবনে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। রজত মহাভারত যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত বসিল। রাণু প্রবেশ করিতে সে বলিয়া উঠিল—রাণু আমায় দিন পনরর ছুটি দিতে হবে!

কেন?

একবার সুন্দরবনে যাব।

রাণু ঠাট্টার সুরে বলিল, জমিদারী দেখতে বুঝি,—নায়েবরা খুব চুরি করছে!

রজত বলিল, হাঁ, জমিদারীও দেখা দরকার আর ঐ সঙ্গে গোটাকয়েক বাঘও মারব!

'বাব'! রাণু চমকিত হইয়া উঠিল! রজত আড়চক্ষে তাহা লক্ষ্য করিল!

আপনি বাঘ মারতে পারেন? কই আমাকে ত বলেন নি?

রজত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, হামেশাই ত মারছি, কত বল্‌ব। আমি যে দু-বেলা ভাত খাই, তা-ও ত তোমাকে বলি নি?

রাণু বিস্মিত ভাবে বলিল, কিন্তু আপনাকে দেখে ত মনে হয় না যে আপনি বাঘ মারেন।

রজত চেয়ার হেলান দিতে দিতে বলিল, আমাকে দেখে কার কি মনে হবে সেজন্য কি আমি দায়ী?

আপনি ক'টা বাঘ মেরেছেন?

হবে পঞ্চাশ ষাটটা।

তার মধ্যে রয়াল বেঙ্গল কটা?

রজত হাসিয়া বলিল, রয়াল বেঙ্গল ছাড়া ত আমি অন্য কিছু মারিনে।

রাণু এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবার বসিয়া পড়িল।

রজত এতক্ষণ বসিয়াছিল, এবার দাঁড়াইয়া উঠিল: কহিল চলি তবে।

না, না, একটু বসুন; চা খেয়ে নিন।

চা হইল, জলযোগ হইল। রজত চা পান করিয়া বুঝিল আজকার চায়ে চিনির সঙ্গে রাণুর অনুরাগ মিশিয়াছে।

রজত জিজ্ঞাসা করিল, কি বল রাণু, তোমার জন্য একটা বাঘ আনব না কি?

রাণু বিস্মিত আনন্দে উজ্জল হইয়া বলিয়া উঠিল, বেশ মজা হবে, বেশ মজা হবে।

রজত ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, জ্যান্ত না মরা?

রাণু ভীতভাবে বলিল, জ্যান্ত ? না, না, সে হবে না।

আচ্ছা তবে মরাই আনব, এই বলিয়া রজত উঠিয়া পড়িল।

রাণু দুয়ার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিল ; একবার থামিল, একবার ইতস্তত করিল, একবার কাশিল, তার পরে বলিয়া উঠিল, না-হয় বাঘ শিকারে নাই গেলেন !

রজত হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

রাণু লজ্জাজড়িত উৎকণ্ঠার সহিত বলিল, তবে একটু সাবধানে থাকবেন। কবে আসবেন ?

দিন পনরর মধ্যে বলিতে বলিতে রজত আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া আসিল। রজত আজ রাণুর চোখে এমন একটি আশ্বাসভরা দীপ্তি এবং সিক্তপ্রায় আঁখিপল্লবের ভঙ্গী দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে সে বুঝিল বহুদিন অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া দূরে দীপের আলো দেখিয়া কলম্বসের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল আর কি সান্ত্বনা পাইয়াছিল সেই হতাশ নাবিক সমুদ্রের জলে সদ্যভগ্ন বৃক্ষপল্লবের সাক্ষাতে।

দিন পনর পরে একদিন বিকালে রাণুদের বাড়িতে রজতের মোটর আসিয়া থামিল। রজত লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পাঁচ-সাত জন লোকের সাহায্যে টানিয়া নামাইল প্রকাণ্ড এক বাঘ। রাণুর এত দিন উৎকণ্ঠায় কাটিতেছিল, খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল ; দেখিল সত্য সত্যই তাহার বাঘ আসিয়াছে, একেবারে খাঁটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

রাণু বিস্ময়ে, ভয়ে, গর্ব্বে, উল্লাসে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে মাপিয়া দেখিল বাঘটা নাক হইতে লেজের ডগা পর্য্যন্ত পাকা নক্ক

ফুট! রজত রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, রুমালে রক্ত কিসের? আপনার?

রজত হাসিয়া বলিল, বাঘের।

রাণু ছোঁ মারিয়া রুমাল কাড়িয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল; রজত তাহাকে অনুসরণ করিল।

ঘরের মধ্যে কি হইল জানি না। কিন্তু যখন রজত বাহির হইয়া আসিল তাহার মুখে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের গর্ব্ব ও তৃপ্তি।

রজত রাণুর বাপের কাছে তাহার প্রার্থনা জানাইল। তিনি তাহার করমর্দ্দন করিলেন। পরের দিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। রাণু রজতের বাগ্‌দত্তা বধূ।

বিবাহের দিন পয়লা বৈশাখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজত প্রত্যহ আসে, গল্প করে, চা খায়, রাণুর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়ি ফেরে। সেদিন বাঘ শিকারের গল্প হইতেছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি গাছে উঠে বাঘ মার?

রজত সিগারেটে টান মারিয়া বলিল, প্রথমে তাই করতাম, এখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মারি!

রাণু শিহরিয়া উঠিল।

আচ্ছা ক'টা গুলিতে বাঘ মরে?

একটা! দেখ নি বাঘটার দুই চোখের মাঝখানে গুলির দাগ!

রাণু দেখিয়াছে বটে।

অনেক রাতে রজত উঠিয়া গেল। রাণু যাইবার সময় তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে সে আর বাঘ মারিবে না। কিন্তু রজত কি

প্রতিজ্ঞা করিতে চায়! শিকার না করিতে পারিলে তাহার আর বাঁচিয়া লাভ কি! অবশেষে অনেক অনুযোগ, অনুরোধ, অভিমানের পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রজত প্রতিজ্ঞা করিল। রাণুর বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল, রজত সত্যই সত্যই তাহাকে ভালবাসে নহিলে এত বড় ত্যাগ-স্বীকার করিবে কেন?

রাণু বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শিকারের কাহিনী, সুন্দরবনের গভীর অরণ্য; পালে পালে হরিণ, ইতস্তত বাঘ; যেখানে-সেখানে অজগর সাপের দল। তার মধ্যে একাকী বন্দুকধারী বীরপুরুষ! উঃ তার কল্পনা বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিল। এমন স্বামী-সৌভাগ্য তার হইবে সে কথনই ভাবে নাই। রাত এগারটা বাজে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল; দেখিল রজত একখানি বই ফেলিয়া গিয়াছে, আধুনিকতম একখানা কন্টিনেন্টাল উপন্যাস! রাণু বইটি লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইল। বইখানা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে কি মন বসে! প্রথমেই দুই রুগ্ন যুবক-যুবতীর চা-পানের কাহিনী! কোথায় সুন্দরবনে বাঘ-শিকার, আর কোথায় চা-পানের গল্প! নাঃ, জীবনে যদি কোথাও রোমান্স থাকে তবে তাহা ওই সুন্দরবনে। রাণু বই ফেলিয়া দিল। পাতার মধ্য হইতে একখানা কাগজ উড়িয়া পড়িল। বোধ হয় রজত পাতায় চিহ্ন রাখিয়াছে মনে করিয়া রাণু কাগজখানা তুলিল, দোকানের বিল। রজতের নাম দেখিয়া রাণু পড়িল, লেখা আছে—Supplied to Mr. Rajat Ranjan Roy, a Royal Bengal tiger measuring nine feet from head to tail for Rs. 350 only less advance Rs. 100—Rs. 250 only.

হাঁ, দোকানের বিলই' বটে। একেবারে সাহেবী দোকানের। ম্যানেজারের অস্পষ্ট নাম-সহিটি পর্য্যন্ত নির্ভুল। বিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাণুর মগজের মধ্যে এক ঝলক দিব্যদৃষ্টি খেলিয়া গেল এবং সে ভারী একটি স্বস্তি অনুভব করিল।

ইহার পরে ঘটনা সংক্ষেপ। পাঠক ভাবিতেছেন বিবাহ ভাঙিয়া গেল। বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। রাণু কোনদিন সে বিলের কথা রজতকে জানায় নাই। রজত মাঝে মাঝে শিকারে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। রাণু তাহাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া দিত। সে নয় ফুট দীর্ঘ বাঘটার মাথা রাণুর বসিবার ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইল। রাণু তাহার তলায় লিখিয়া দিল—যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। রজত চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও আবার কি?

রাণু বলিল, ও একটা সখ!

রজত নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল ওটা বোধ হয় রাণুর একটা মহাভারতীয় সংস্কার।

নগেন হাড়ীর ঢোল

ডুম্, ডুম্, ডুম্…ডুম্, ডুম্, ডুম্…আঃ, কান ঝালাপালা হইয়া গেল। রাত নাই, দিন নাই কেবলই কি ঢোলের বাজনা ভাল লাগে! সকালে, বিকালে, দুপুরে,—হাটে, বাজারে, পথে—সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র কেবল ঢোলের শব্দ! গাঁয়ের লোক অস্থির হইয়া উঠিল। না হয় সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলী—তাই বলিয়া কি কারো কাজকর্ম্ম নাই—আর নিষ্কর্ম্মা লোকেই এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে সারাদিন বসিয়া তাকে ঢোলের শব্দ শুনিতে হইবে!

সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না—সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলী—কখন্ কার দরকার হয়!

গাঁয়ের নাম জোড়াদীঘি—এক সময়ে মস্ত গ্রাম ছিল—এখন থাকিবার মধ্যে ঐ নামটি আছে। তখনকার কালে আদমশুমারির ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আদমি এতই ছিল যে উপকথার শিয়ালের কুমীরের ছানা দেখানোর মত এক জনাকে সাতজনা করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইত না।

গাঁয়ে জেলে ছিল এমন পঞ্চাশ-ষাট ঘর, নদী মরিয়া গেল, জেলেরা ঘরবাড়ী বেচিয়া বড় নদীর ধারে উঠিয়া গেল; পঞ্চাশ-ষাটখানা শূন্য ভিটা শীতের রোদে নদীর চরে একপাল কাছিমের মত পড়িয়া রহিল।

আট দশ ঘর ছুতোর ছিল—কতক মরিল, কতক জাতব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া চাষবাস ধরিল, কতক অন্য গাঁয়ে উঠিয়া গেল।

কামার ছিল চার-পাঁচ ঘর—জোড়াদীঘির জাঁতি ও কাটারি এ-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। নদী মরিয়া গিয়া ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইলে তারা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে হাতুড়ি চালাইবার ক্ষমতা আর তাদের রহিল না; প্রথমে হাতুড়ি গেল, তারপরে হাত গেল,—ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল; বোধ হয় এখন তারা গোপনে শুধু সিঁধকাঠি তৈয়ার করিয়া থাকে —গাঁয়ে বড় সিঁধেল চোরের উপদ্রব।

ধোপা কাপড়কাচা ছাড়িয়া চৌকিদারি চাকুরী লইল; নাপিতের আর জাতব্যবসা করিয়া চলে না—সে বেগুন ও কলার চাষ আরম্ভ করিল, গাঁয়ের লোকে দাম দিতে গোলমাল করে দেখিয়া গোয়ালা ভিন্ গাঁয়ে দই ক্ষীর বেচিতে লাগিল—ইহা দেখিয়া গাঁয়ের কয়েকজন লোক অপমানিত বোধ করিয়া এক দিন রাত্রে তাকে ধরিয়া মারিল—পরের দিন সে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া নাজিরপুর চলিয়া গেল।

গ্রামের জমিদারের অবস্থা এক সময়ে ভাল ছিল, কিন্তু নদীর সঙ্গেই সব যোগ—নদী মরিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজা মরিতে লাগিল—জমি পলাতক পড়িতে লাগিল—খাজনা অনাদায় হইল—ক্রমে জমিদারির ক্ষীণ স্রোত শনৈঃ শনৈঃ মহাজনের সিন্দুক-সঙ্গমের অভিমুখে চলিল—এখন তার শুধু নামটা আছে, আর আছে পৈত্রিক প্রকাণ্ড বাড়ী—চূণকামের অভাবে প্রতি বছর তার মুখ আরও একটু করিয়া কালো হইতেছে।

গ্রামের এ অবনতির জন্য দোষ কার?

সকলে একবাক্যে বলে—অদৃষ্ট! কিন্তু পদ্মায় নাকি কোথায় একটা প্রকাণ্ড পুল বাঁধা হইয়াছে—দুই ধারে পাথর ঢালিয়া পাহাড়-প্রমাণ উঁচু করা হইয়াছে, জোড়াদীঘির নদীর মুখ পুলের উজানে—সেখানে মস্ত

চড়া পড়িয়াছে—দেখিতে দেখিতে পঁচিশ বছরের মধ্যে নদী শুকাইয়া গেল। আমরা জানি গ্রামের ধ্বংসের মূলে ঐ পুল—লোকে বলে অদৃষ্ট—কি জানি হইতেও পারে—এদেশে সবই সম্ভব!

এবার পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি জন্য গাঁয়ের লোক সারাদিন ঢোলের শব্দ সহ্য করে। আগে অনেক ঘর হাড়ী ছিল—তারাই বাজনাদারের কাজ করিত। একবার বৈশাখ মাসে কলেরা লাগিল; (পল্লী-অঞ্চলের ছয় ঋতুর প্রভেদ ছয় ব্যাধির দ্বারা বোঝা যায়) হাড়ী-পাড়া সাফ হইয়া গেল—কেবল রমেশ হাড়ীর ছয় বছরের নাবালক ছেলে আর স্ত্রী বাঁচিল। ছেলেকে সঙ্গে করিয়া রমেশের স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। সে আজ দশ বছরের কথা—এ দশ বছর গাঁয়ে ঢুলী ছিল না—পালপার্ব্বণের সময়ে লোকে বিপদে পড়িত—অনেক বেশী খরচ করিয়া অন্য গ্রাম হইতে ঢুলী আনিতে হইত।

হঠাৎ আজ কয়েক দিন হইল রমেশ হাড়ীর ছেলে নগেন গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। মায়ের মৃত্যুর পরে সে আর মামার বাড়ী থাকিতে রাজী হইল না।

প্রথমে প্রতিবেশীরা তাকে চিনিতে পারিল না—তাদের দোষ দেওয়া যায় না, ছয় বছরের ছেলে দশ বছর পরে ফিরিলে চেনা সহজ নয়। নগেন আত্মপরিচয় দিল, প্রতিবেশীদের রমেশকে মনে পড়িয়া গেল—শুধু তাই নয়, সকলেই সহসা নগেনের মুখে, চোখে, হাবভাবে, কথাবার্ত্তায় রমেশের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। কেহ বলিল—রমেশই যেন ষোল বছরের হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ বলিল—হাজার লোকের মধ্যেও তাকে রমেশের ছেলে বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। নগেন প্রতি-

বেশীদের দৃষ্টিশক্তিতে বিস্মিত হইয়াছিল—কিন্তু জানিত না আরও বিস্ময় তার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

নগেনের মা জোড়াদীঘি ছাড়িয়া বাপের বাড়ী যাইবার সময়ে তৈজস, খান-দুই তক্তপোষ, একটা কাঠের সিন্দুক এবং একটা ঢোল প্রতিবেশীদের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল—নগেন সেই পৈতৃক সম্পত্তিগুলি দাবি করিতেই প্রতিবেশীদের নানা রকম অনিবার্য্য কাজ মনে পড়িয়া গেল—তারা মূঢ় নগেনকে ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

তারপরে নগেন তাগিদ আরম্ভ করিল,—হাঁটাহাঁটি করিল, কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু নশ্বর তৈজসপত্র আর ফিরিয়া পাইল না। তার সবচেয়ে লোভ ছিল ঐ সিন্দুকটার উপরে—বহুদিন সে মার মুখে পৈত্রিক সিন্দুকের কথা শুনিয়াছে; তার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সিন্দুকটার মধ্যে তার পিতার সারাজীবনের সঞ্চয় রহিয়াছে—একবার তাহা পাইলে তার আর অভাবঅভিযোগ থাকিবে না।

তিনু ধোপার (এখন সে চৌকিদার) বাড়ীতে সিন্দুকটা ছিল; নগেন দাবী করিতে সে স্পষ্ট বলিয়া দিল—হ্যাঁ একটা কাঠের বাক্স ছিল বটে ওইখানে প'ড়ে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না—বোধ হয় উই ইঁদুরে কেটে কেটে খেয়ে ফেলেছে। সংসারের কোন বস্তুই যে অবিনশ্বর নয়, এই ঘটনায় নগেন তার প্রথম প্রমাণ পাইল—সে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু সংসারে সবাই অসাধু নয়। মোতি ছুতোর একদিন বিকাল বেলা একটা ঢোলের খোল আনিয়া নগেনকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল—তার মা যাইবার সময়ে এই খোলটা তার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছিল—এত দিন সে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে; এ দায়িত্ব আর সে বহন করিতে পারে

না—যার জিনিষ সে গ্রহণ করুক। এই বলিয়া সে অতি জীর্ণ উইয়ে-কাটা ঢোলের কাষ্ঠ-গোলকটি নগেনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেল—নগেন খোলের ফাঁকের ভিতর দিয়া নদীর ওপারের ঢালু মাঠের বাবলা বনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

পরের দিন সে খোলটা ঘাড়ে করিয়া জমিদার-বাড়ীতে গিয়া জমিদার তারানাথ বাবুর কাছে আত্মপরিচয় দিল। তারানাথবাবু রমেশকে জানিতেন; নগেন ফিরিয়া আসাতে তাঁর এক ঘর প্রজা বাড়িল, কিছু আয়বৃদ্ধি হইল, মানসাঙ্কে বিদ্যুতের মত ইহা খেলিয়া গেল; তিনি তাকে ঘর তুলিবার জন্য সাহায্য করিলেন—আর ঢোলটা চামড়া দিয়া আচ্ছাদন করিয়া লইবার জন্য নগদ পাঁচসিকা তার হাতে দিলেন।

নগেন লক্ষ্মীপুরের হাটে গিয়া খোলটাকে পালিশ করিয়া রং করাইয়া লইল; মুচি দিয়া চামড়া লাগাইল—আর পালকের সাজ পরাইয়া ঢোলটাকে একেবারে নূতন করিয়া ফেলিল। তারপরে সগৌরবে সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। গাঁয়ের লোক নগেন হাড়ীর ঢোল দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাক এত দিনে গাঁয়ের বাজনার অভাব দূর হইল।

২

নগেন হাড়ীর ঢোলের অবিরাম বাজনায় গাঁয়ের লোকে বিরক্ত হইলেও এই সব নানা কারণে সকলে চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন অতি তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

হরিচরণ জোড়াদীঘির একজন জালহীন জেলে, চাষবাস করিয়া খায়। অন্য জেলেরা গ্রাম ছাড়িয়া গেল, হরিচরণ যাইতে পারিল না; লোকের কাছে সে বলিয়া বেড়াইল, সাত পুরুষের ভিটা কি ত্যাগ করা যায়! আসল কথা অন্য রকম: হরিচরণ গাঁজা খায়; জোড়াদীঘি ছাড়া আবগারির দোকান আশপাশের গাঁয়ে নাই, কাজেই সে জোড়াদীঘি ছাড়িতে পারিল না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে সে বাজারে আবগারির দোকানের দিকে যায়—ফিরিবার সময়ে তুরীয় অবস্থায় ফেরে; এখন, বাজারের পথের পাশেই নগেন হাড়ীর ঘর। সেদিন সন্ধ্যায় হরিচরণ বাজার হইতে ফিরিতেছে, এমন সময় তার কানে গেল—ঢোলের ডুম্, ডুম্, ডুম্। হরিচরণ ঢোলের তালে তালে বলিয়া উঠিল—ডুম্, ডুম, ডুম; এক বার, দুই বার, তিন বার। নগেন রাগিয়া গিয়া নিষেধ করিল—জেলের পো ঠাট্টা ক'রো না বলছি। জালিকপুত্রের তখন চতুর্থ অবস্থা; সে উচ্চতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ডুম, ডুম, ডুম।

নগেন দাওয়ার উপরে বসিয়া ছিল, নামিয়া আসিয়া ঢোলের কাঠি হাতে তার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল—ফের ঠাট্টা?

হরিচরণ ঈষৎ রাগিয়া উত্তর দিল—তোর ঢোলে তুই যা খুশী বলিস, আমার মুখে আমি যা খুশী বল্‌ব, ঠেকায় কে !

ঠেকাই আমি—এই বলিয়া ক্রুদ্ধ নগেন ঢোলের কাঠি দিয়া হরিচরণের পিঠে আঘাত করিল। অমনি যায় কোথা—দুই জনে হাতাহাতি বাধিয়া গেল ; হরিচরণের বয়স বেশী, তাতে নেশাগ্রস্ত, সে পড়িয়া গিয়া আহত হইল ; কিছুক্ষণ পরে প্রতিবেশীরা আসিয়া দুই জনকে নিরস্ত করিল।

পরদিন গাঁয়ের লোকে ঘটনা শুনিয়া রাগিয়া গেল ; কেহ বলিল—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ; কেহ বলিল—যত বড় ঢোল নয় তত বড় বোল ; হরিচরণ পিঠের আঘাত স্মরণ করিয়া বলিল, যত বড় কাঠী নয় তত বড় ঘা। কিন্তু কেহ নগেনকে কিছু বলিতে সাহস করিল না—সে জমিদারের অনুগৃহীত জীব।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে জমিদারের প্রথম পৌত্রের জন্ম হইল ; নগেনের বাজনা এর আগে কেবল দিনে চলিত, এবার অহোরাত্রব্যাপী হইয়া উঠিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—কর্ত্তার নাতির ভাতে বাজাতে হবে না! তাই হাতটা সই ক'রে নিচ্ছি। বড়লোকের ব্যাপার, বাজনা খারাপ হ'লে লোকে বলবে কি ?

হরিচরণের ঘটনাকেও লোকে প্রয়োজনের আশায় সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আর একটা ঘটনায় লোকের সে-আশাও ভঙ্গ হইল। রতন মুচির ঘর গাঁয়ের প্রান্তে ; লোকটা ভালমানুষ অর্থাৎ জিনিষ লইয়া নগদ দাম দেয়, এবং জুতা সারিয়া দিয়া পয়সার জন্য তাগিদ করে না। এ হেন রতনের একটি পুত্র-সন্তান হইল—গাঁয়ের লোক উল্লসিত হইয়া উঠিল,

আশা করিল রতনের অর্থ নৈতিক আদর্শ ও ধারা তার পুত্রের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

কয়েক দিন পরে রতন নগেনের বাড়ীতে গিয়া একটা সিকি তার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—ভাই একবার আমার বাড়ীতে যেতে হবে, মানে কিনা, আজ ষষ্ঠীপূজো একটু বাজিয়ে আসতে হবে।

নগেন তার সিকিটা পা দিয়া ঠেলিয়া বলিল—মুচির ছেলের ষষ্ঠী-পূজোতে আমার ঢোল বাজে না।

রতন তার যুক্তি না বুঝিতে পারিয়া বলিল—ঢোলের কি আবার জাত আছে নাকি?

—তবে রে জাত তুলে কথা?—নগেন লাফাইয়া উঠিল। রতন সিকিটা কুড়াইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল; পথে সে একবার বাজারে গিয়া ঘটনাটা সকলকে বলিয়া বুঝাইয়া দিল, গাঁয়ের লোকের আশা সফল হইবার নয়, নগেন সকলের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে ঢোল ঘাড়ে করিয়া যাইবে না!

একজন জিজ্ঞাসা করিল—তবে ওর চলবে কি করে?

রতন বলিল—কেন, জমিদারের নাতির ভাতে সে বাজাবে! সেই জন্যই তো ও দিনরাত হাত তামিল করছে।

কিন্তু তার তো অনেক দেরি!

হরিচরণ কাছেই বসিয়া ছিল; পিঠের ব্যথা তার তখনো যায় নাই; নগেনের ব্যবহারে সে জমিদারের উপরে চটিয়া গিয়াছিল—সে গলা একটু খাটো করিয়া বলিল—ক'দিন সবুর কর না; দেখ কার ভাতে কে ঢোল বাজায়!

সকলে উৎসুক হইয়া উঠিল—ব্যাপার কি?

হরিচরণ আরও গলা খাটো করিয়া বলিল—বেশী দিন আর জমিদারি করতে হবে না। মছলন্দপুরের বাবুরা অনেক টাকার ডিক্রী করেছে—সব গেল ব'লে! তখন দেখা যাবে বেটা কার ভাতে ঢোল বাজায়।

আবগারি-ওয়ালার রসিক বলিয়া খ্যাতি ছিল, সে বলিল—ঢোল বাজাবে বইকি! ভাতে নয় নীলামে।

ঘটনা সত্য কি মিথ্যা সে প্রশ্ন কেহ করিল না; অন্যের বিপদ যে এত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই সকলে খুশী হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

৩

জমিদার তারানাথবাবুর অবস্থা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, বাইরের ভানটি শুধু বজায় আছে, কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না; তাঁর অধিকাংশ সম্পত্তি পত্তনী সম্পত্তি; বছর-শেষে মালেক জমিদারকে মোটা টাকা খাজনা দিতে হয়; এর মস্ত অসুবিধা এই যে খাজনা চার বছর পর্য্যন্ত বাকি ফেলা চলে, লাটের খাজনার মত কিস্তি কিস্তি শোধ করিতে হয় না! চার বছরের খাজনা সুদে-আসলে দশ-বার হাজার টাকার মত হইল; মালেক জমিদার নালিশ করিল; আদালতের কৌশলে যত দূর ঠেকানো সম্ভব তারানাথবাবু ঠেকাইল; কিন্তু আর ঠেকে না; মালেক জমিদার তারকনাথবাবুর ভূসম্পত্তি নীলামের জন্য পরোয়ানা বাহির করিল।

ব্যাপারটা গ্রামে চাপা ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমিদারের কর্ম্মচারীদেরই মুখরতার অবকাশে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কাজেই নগেন যখন জমিদারের পৌত্রের অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন অদৃষ্ট নীলামের জন্য ঢোল বাজাইবার একটা কারণ প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল।

নগেন গ্রামের মধ্যে নিতান্ত একা। বয়স্কদের সঙ্গে তার মেলে না, তারা তাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; হরিচরণ ও রতনের ঘটনার পর হইতে কেহ আর তাকে দেখিতে পারে না। সমবয়স্কদের নগেন এড়াইয়া চলে ; তার ধারণা সকলেরই লক্ষ্য তার ঢোলের উপরে। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। প্রথমে তার সমবয়স্ক বালকেরা তার বাড়ীতে আসিত, গল্পগুজবও করিত এবং মাঝেমাঝে ঢোলটা লইয়া তাতে নানারূপ বোল তুলিবার চেষ্টা করিত। নগেনের ইহা ভাল লাগিত না ; প্রথমে প্রথমে সে মুখে নিষেধ করিত ; একদিন একজনকে কড়া করিয়া বলিল, আর একদিন আর একজনকে দু'ঘা চর বসাইয়া দিল ; তারপরে ঢোল ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত ; শেষে অবস্থা এমন হইল যে, কেহ তার বাড়ীতে আর আসিত না। নগেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল ; সে সারাদিন বসিয়া কখনও ঢোলটাকে নূতন রঙ লাগাইত ; কখনও নূতন পালকের সাজ বসাইত ; আর জমিদারের নাতি জন্মিবার পর হইতে অদূরবর্ত্তী অন্নপ্রাশনের উৎসবের জন্য ঢোলে নূতন নূতন বোল তুলিতে প্রয়াস করিত ; ঢোলের সাহচর্য্যে তার সময় আনন্দে কাটিয়া যাইত, নিসঙ্গতা সে অনুভব করিত না!

৪

তারানাথবাবুর নাতির অন্নপ্রাশনের নির্দ্দিষ্ট তারিখের কাছাকাছি একদিন জোড়াদীঘির বাজারে বড় সোরগোল পড়িয়া গেল। জমিদারপক্ষ হইতে প্রথমে ব্যাপারটা চাপিয়া দিবার চেষ্টা হইল—বেসরকারী ভাবে টাকা দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার, সংক্ষেপে ঘুষ দিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই ফল ফলিল না; ক্রমে ঘটনা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল—মালেক জমিদারের পক্ষ হইতে লোক ও আদালতের পেয়াদা তারানাথবাবুর জমিদারী নীলাম করিতে আসিয়াছে।

তারানাথবাবু প্রতিপত্তিশালী লোক—সেজন্য অপর পক্ষে আয়োজনের ত্রুটি করে নাই; চার-পাঁচ জন নিজ পক্ষের পাইক; দুই-তিনজন চাপরাশ-ধারী আদালতের পেয়াদা ও নিশানদার সঙ্গে ছিল। তারা বাজারের এক দোকানে ঘাঁটি গাড়িয়া একজন ঢুলীর সন্ধান করিতে লাগিল।

সকলেই জানেন যে এ-সব ব্যাপারে ঢুলী ঘটনাস্থলে আসিয়া সংগ্রহ করা হয়, সঙ্গে করিয়া কেহ আনে না; আরও জানা উচিত যে, অধিকাংশ সময়েই ঢুলীর উল্লেখ কাগজেপত্রেই হয়, বাস্তবে তার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে, বিশেষ যেখানে অপর পক্ষ প্রবল, পরে মামলা-মোকদ্দমার আশঙ্কা আছে, সে-সময় ঢুলীকে বাস্তব রঙ্গমঞ্চে ডাক পড়ে; ঢুলী আসিয়া নগদ দক্ষিণা লইয়া আদালতের পেয়াদার মন্ত্র-আবৃত্তির সঙ্গে ঢোলে কয়েক ঘা দিয়া যায়।

আদালতের পেয়াদা জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে ঢুলী আছে কি না?

সকলের সমস্বরে বলিল—হাঁ! নাম তার নগেন হাড়ী—

তিনু ধোপা (সম্প্রতি সে চৌকিদার) নগেনকে ডাকিতে গেল। যে-জমিদারের নাতির অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজাইবার জন্য আজ সে কয়েক মাস হইল প্রস্তুত হইতেছে, তার সম্পত্তি নীলামের জন্য ঢোল বাজাইতে হইবে শুনিয়া নগেন বলিল—তাহার শরীর ভাল নাই, সে যাইতে পারিবে না।

তিনু ফিরিয়া গেলে অপর পক্ষের কর্ম্মচারী নগেনের বাড়ী আসিল। সে নগেনের সম্মুখে নগদ আড়াইটা টাকা রাখিয়া বলিল—ওহে বাপু একবার চল—বেশী কষ্ট করতে হবে না। ঐ বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বারকয়েক বাজিয়ে দিলেই চলবে।

নগেন টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—যেদিন তোমার জমিদারের সম্পত্তি নীলাম হবে সেদিন ডেকো, বিনা-পয়সায় বাজিয়ে আসব।

অপর পক্ষের লোক রাগিয়া উঠিয়া বলিল—আ মলো যা—ছোঁড়ার যে ভারি তেজ! ভালোয় ভালোয় যাবি তো চল—নইলে আদালতের পেয়াদা এসে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাবে!

নগেন বলিল—যা তোর বাপকে ডেকে আন্।

অপর পক্ষের কর্ম্মচারী ক্রুদ্ধ হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল—বোধ হয় তার পিতাকে আনিবার জন্যই।

ব্যাপার শুনিয়া আদালতের চপরাশী লাল হইয়া উঠিল অর্থাৎ পাগড়িটা মাথায় জড়াইয়া লইল—থাকি জামার উপরে চাপরাশটা বাঁধিয়া লইল—এবং ব্রিটিশ আইনের প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্যে সকলকে লইয়া নগেনের বাড়ীর দিকে চলিল!

সকলে নগেনের বাড়ী পৌছিয়া দেখিল—সে উঠানে দিব্য নিশ্চিভাবে বসিয়া একখানা সান্‌কিতে করিয়া পান্তাভাত খাইতেছে।

চাপরাশী বলিল—এই বেটা চল্ জানিস কোম্পানীর কাজ!

নগেন শান্ত ভাবে বলিল—চল যাচ্ছি। খেয়ে নি।

সকলে অপেক্ষা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল—কোম্পানীর কি মহিমা! যে-কাজ নগদ আড়াই টাকায় সম্ভব হয় নাই, তাহা পেয়াদার উপস্থিতি মাত্রেই সম্ভব হইল!

নগেন আহার শেষ করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চন্তভাবে বলিল—চল, কোথায় যেতে হবে।

চাপরাশী গর্জ্জন করিয়া বলিল—নে ঢোল কাঁধে নে'

নগেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলিল—ঢোল! ঢোল তো আমার নেই।

নাই! লোকটা বলে কি!—সকলে চমকিয়া উঠিল।

তিনু বলিয়া উঠিল—পেয়াদা সাহেব মিথ্যা কথা! ঢোল ছাড়া ও বাঁচবে কি ক'রে? নিশ্চয়ই ওর ঘরের মধ্যে আছে।

পেয়াদার হুকুমে দু-তিন জন তার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় ঢোল আছে।

কিন্তু কোথাও ঢোল পাওয়া গেল না। পেয়াদার হুকুমে ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল—কোথাও ঢোল নাই।

অবশেষে একজন মাচার নীচে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে! পেয়েছি! সে ঢোলটা টানিয়া বাহির করিল। কিন্তু একি! সবাই অবাক্ হইয়া গেল। এ যে চামড়া-কাটা, খোল-

ফাটা, পালক-ছেঁড়া, কাঠ চামড়া আর পালকের একটা স্তূপ। এই কি নগেনের বহু সাধের ঢোল!

পেয়াদা গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই বেটা তোর ঢোল কোথায়?

নগেন হাসিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিল—উই যে! তার পরে বলিল—চল কোথায় যেতে হবে।

অপর পক্ষের লোকেরা আশাভঙ্গ হওয়াতে চটিয়া বলিল—নে, নে ভাঙা ঢোল নিয়ে আর যেতে হবে না।

নগেন শান্তভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—যে-দিন তোমার জমিদারের সম্পত্তি নীলাম করবার দরকার হবে, সেদিন ডেকো, ভাঙা ঢোল নিয়ে যাব, পয়সা দিতে হবে না।

রাগে ও অপমানে পেয়াদার লাল পাগড়িটা খসিয়া পড়িয়াছিল, সে সেটাকে বাঁধিতে বাঁধিতে সঙ্গীদের বলিল—চল। নগেনের দিকে ফিরিয়া বলিল—নেব বেটা তোকে দেখে!

নগেন বলিল—আর ঢোল তৈরি করলে তো!

সত্যই তারপর হইতে নগেন ঢুলী হইবার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিল।
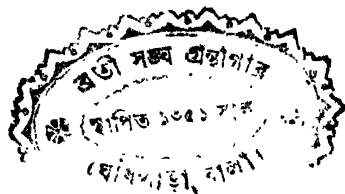
ভেজিটেব্‌ল বোম্‌

আজ আমার এ দুর্ম্মতি কেন হইল? সকাল বেলাতেই কেন নেশা করিয়া বসিলাম? সন্ধ্যাবেলাতে আমার আফিং খাইবার অভ্যাস, আজ কেন সকাল বেলাতেই খাইলাম? যদি নেশা করিলাম, কেন ঘরে পড়িয়া থাকিলাম না? কেন পথে বাহির হইতে গেলাম। আর যদি পথেই বাহির হইলাম কেন মঙ্গি গোয়ালিনীর বাড়ীর দিকে গেলাম না? কেন আমার অভ্যস্ত পা দুটি কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীর দিকে আমাকে লইয়া গেল না? আমাকে কেন কাউন্সিল-ভবনের সম্মুখে লইয়া আসিল?

একি দেখিলাম! জীবনে এ দৃশ্য আর দেখিব না! আফিঙের বাপেরও সাধ্য নাই যে এ দৃশ্য আমাকে আর দেখাইতে পারে। আর আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী যদি এ দৃশ্য দেখিলাম তো তখনই মরিলাম না কেন? মরিতে লিখিতে গেলাম কেন?

দেখিলাম বাঙলার কাউন্সিল গৃহে ধীরে ধীরে, তোমরা ভাবিতেছ স্বর্ণ-প্রতিমা উদিত হইতেছে? না তাহা দেখি নাই, কাউন্সিল গৃহে প্রতিমা দেখাইবার মত শক্তি আফিঙের নাই। দেখিলাম ধীরে ধীরে পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ লোকেরা, দুর্দ্ধর্ষ ডিক্টেটাররা, জাঁদরেল সব সেনাপতিরা কাউন্সিল গৃহের কাছে সমবেত হইয়াছে।

দেখিলাম কালো শার্ট-পরা মুসোলিনী ও কটা শার্ট-পরা হিট্‌লার উমেদারের মত দণ্ডায়মান; জেনারেল ফ্রাঙ্কো (শার্টের কি রং হইবে এখনও ঠিক করিতে পারে নাই। আপাততঃ রক্তে লাল) ও লর্ড

হালিফাক্স আর এক কোণে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে। অদূরে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া, একটা ঘাসের বোঝা ঠেস দিয়া ষ্টালিন কড়া তামাকের পাইপ টানিতেছে আর মাঝে মাঝে সন্দেহের সঙ্গে কালো-শার্ট ও কটা-শার্টের দিকে তাকাইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিক হইতে হন্ হন্ করিয়া ও কে আসিতেছে? লম্বা হেন লোকটা—মুখ শুকাইয়া চুপসিয়া গিয়াছে! চেনা চেনা চেহারা? কাছে আসিতে চিনিতে পারিলাম—ওমা এযে চেম্বারলেন সাহেব; বগলে একটা ইংলণ্ডের ইতিহাস; একবার ষ্টালিনের দিকে চাহিয়া হাসিল—আবার ফ্রাঙ্কোর দিকে চাহিয়া হাসিল; ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল সে দুজনের দিকেই। একটা ষ্ট্যাচুর আড়ালে কে যেন চিনা বাদাম ভাজা খাইতেছিল, কাছে যাইতেই মুখে আঙ্গুল দিয়া শব্দ করিতে নিষেধ করিল, এবং পর মুহূর্ত্তেই ইঙ্গিতে হিট্লারকে দেখাইয়া দিল; চেহারা দেখিয়া লোকটাকে ডক্টর শুস্নিগ বলিয়াই মনে হইল।

একটু পরে ইডেন-উদ্যানের দিক হইতে দুইজন লোককে আসিতে দেখিলাম; একজনের মুখ চাঁদের মত গোল, তবে চাঁদের কলঙ্ক নাই, গোঁপ-দাড়ী কিছুই ওঠে নাই; হাতে সকাল বেলাকার কাগজ ছিল, চেহারা মিলাইয়া লইলাম, লোকটা চিয়াং কাইশেক, তার সঙ্গী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট।

এরা ছাড়া আরো অনেক লোক আছে, তবে তাদের দিকে বড় কেহ তাকাইয়া দেখে না; তারা সব ছোট শরীকের মালিক বা নায়েব—এদের মধ্যে হোজা ও হাইলে সেলাসীকে কেবল চিনিতে পারিলাম।

ভারি ভীড় জমিয়া গিয়াছে; কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া একটা

পুলিশকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার চেহারা দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল ; অনুসন্ধান করিবার জন্য পকেটে হাত চালাইয়া দিল—অন্যদিক দিয়া তার হাত বাহির হইয়া আসিল। তখন লোকটা হতাশ হইয়া আমার পিতার সম্বন্ধে একটা শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়া ধাক্কা দিয়া আমাকে সরাইয়া দিল—আর একটু হইলেই মুসোলিনীর ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছিলাম !

অনেক জিজ্ঞাসা করার পরে যাহা জানিতে পারিলাম তাহা এই :—

ইউরোপের লোকেরা সম্প্রতি যুদ্ধ করা ছাড়িয়া দিয়াছে। দু' হাজার বছর তারা যুদ্ধ করিয়া দেখিয়াছে যুদ্ধে কোন সমস্যার মীমাংসা হয় না, যুদ্ধে মানুষ মরে, ব্যয় বহুত, খরচ পোষায় না ; যুদ্ধ আজকাল বিলাসিতা মাত্র ! বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারে যাহা সম্ভব হয় নাই, পকেটে টান পড়িতেই তাহা সম্ভব হইয়াছে, ইউরোপের লোকের বুদ্ধি, হৃদয় সব ওই পকেটে ; তারা ধার্ম্মিক বটে কিন্তু তার চেয়েও বেশী হিসাবী।

কিন্তু যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেই তো আর সমস্যা ফুরায় না ; সম্প্রতি মস্ত এক সমস্যা ইউরোপকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে ! উত্তরমেরুর এস্কিমোদের দেশে খেলার ঝুনঝুনী কে বেচিবে এই লইয়া হিট্‌লার ও ষ্ট্যালিনের মধ্যে মন কষাকষি বড় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। দু'জনেই বলিতেছে খেলিতে না পারিয়া এস্কিমোরা নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধঃপাতে যাইতেছে, তাদের উন্নতি বিধান করিতে না পারিলে ডিক্টেটারদ্বয় ঘুমাইতে পারিতেছে না। দু'জনের অনেক পরামর্শদাতা জুটিয়া গিয়াছে।

মুসোলিনী হিট্‌লারকে বলিল—ওদের মাল জাহাজে যাইতেছে,

তুমি এরোপ্লেনে পাঠাও—আগে পৌঁছিবে। তাতেও ওরা যদি না কেনে তবে গোটাকতক বোমা ফেলিলেই চলিবে। ইউরোপের বাহিরে এখনো যুদ্ধে ফল পাওয়া যায়—আবিসিনিয়ার কথা মনে করো।

চিয়াং কাইশেক ষ্ট্যালিনকে বলিল—তোমাদের ঝুনঝুনির আওয়াজ জ্ঞানের স্বরলিপির মত ও'তে অনেক শিক্ষা হয়, ওরা নিশ্চয় কিনিবে। চেম্বারলেন উভয়কে বলিল—আগে এ বিষয়ে একটা কনফারেন্স বসানো যাক। ততদিন ওখানে কারোই বিক্রি করিতে গিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া তলে তলে নিজের দেশের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে এক জাহাজ ঝুনঝুনী লইয়া যাইতে সে হুকুম দিল। পথের মধ্যে ফ্রাঙ্কো সে জাহাজ ফুটা করিয়া দিয়াছে; চেম্বারলেন ও হালিফ্যাক্স সবচেয়ে উঁচু গলা করিয়া বলিতেছে, যারা অন্যায় ব্যবসা করিতে চায়—তাদের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে।

সকলেই নানা রকম কথা বলিতেছে—যাদের লইয়া এত কাণ্ড, তাদের কথা কেউ ভাবিতেছে না—কারণ ঝুনঝুনী না কেনাতেই এস্কিমোরা সভ্য হইতে পারিতেছে না; তাদের সভ্য না করিলে ইউরোপের শান্তি নাই।

অবশেষে সকলে মিলিয়া ঠিক করিল কাউকে মধ্যস্থ মানা যাক! কিন্তু কে মধ্যস্থ হইবার উপযুক্ত লোক?

চেম্বার লেন বলিল—ইতিহাস পড়িয়া দেখ, আমরা চিরকাল জগতের মধ্যস্থতা করিয়া আসিতেছি; প্রয়োজন হইলেই আমরা কমিশন বসাইয়া থাকি। ভাবিয়া দেখ—আবিসিনিয়া লড়ায়ের সময় কেমন কমিশন বসাইয়া ছিলাম, ইটালীর হুঁকো কল্কে বন্ধ হয় আর কি। কিন্তু

ইতিমধ্যেই আবিসিনিয়ার জয় হইয়া গেল নতুবা কমিশন ঠিক ব্যবস্থাই করিত। এই বলিয়া আড়চোখে একবার মুসোলিনীর দিকে তাকাইল— 'ইল-দুচে' রুমাল মুখে দিয়া হাসিল।

চেম্বারলেন বলিতে লাগিল—আবার দেখ স্পেনের ব্যাপার লইয়া কেমন কমিশন বসাইয়াছি। অবশ্য ফ্রাঙ্কো ধীরে ধীরে জিতিতেছে, কিন্তু তাহা কি আমাদের দোষ?

ফ্রাঙ্কো হ্যালিফ্যাক্সের হাতে একটু চাপ দিল।

চেম্বারলেন—দেখিও আমরা চীন জাপানের যুদ্ধেও কমিশন না বসাইয়া ছাড়িব না।

এমন সময় পিছন হইতে কে যেন রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'নো কমিশন'।

চেম্বারলেন দেখিল জাপানের জেনারেল মিৎসুই।

জাপানীটার ব্যবহারে উপস্থিত সকলে অপমান বোধ করিল কিন্তু চেম্বারলেনের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—সে অম্লানমুখে বলিল—কমিশন না হয়, কমিটি বসাইব; ইংরেজী ভাষা সেক্সপিয়ারের ভাষা—ও-তে শব্দের অভাব নাই।

জাপানীটা আবার বলিয়া উঠিল—'নো কমিতি'।

চেম্বারলেন—তবে নন্ ইন্টারভেনশন।

মিৎসুই গর্জ্জন করিয়া উঠিল—'নো নাথিং!

হ্যান্দস অফ্ ইউ ইউরোপীয়ান!'

সকলে দেখিল বেগতিক, কিন্তু মনে মনে বেঁটে জাপানীটাকে ভয় করে, বলিল—আচ্ছা আচ্ছা থাক; ওরা ইন্টার্নেশন, ওদের মধ্যে গিয়া কাজ নেই!

সকলের উক্তি শুনিয়া চিয়াং কাইশেক শক্ত করিয়া ষ্ট্যালিনের জামার আস্তিন টানিয়া ধরিল।

ফলে এই দাঁড়াইল যে, কেহ ইংরেজের মধ্যস্থতা মানিতে রাজী হইল না। তখন সকলে ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীতে মধ্যস্থ হইবার যোগ্যতম লোক কে? কার রাজ্য নাই, কাজেই রাজ্য বিস্তারের আশা নাই? কার ব্যবসা নাই, কাজেই এস্কিমোদের মধ্যে ঝুনঝুনী বেচিবার আগ্রহ নাই? কার অর্থ নাই, কাজেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই? কে মূর্খ অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ? কে রুগ্ন অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ? কে পরাধীন অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির স্বার্থকে বড় মনে করে?

তখন সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল এমন জাতি এ পৃথিবীতে একটী মাত্র আছে—বাঙালী। তাই আজ সকলে বাঙলার কাউন্সিল গৃহে উপস্থিত—বাঙালী হিটলার ও ষ্ট্যালিনের মনোমালিন্য বিনা যুদ্ধে মিটাইয়া দিবে—বাঙলার গৌরবের চরমতম মুহূর্ত্ত সমাগত।

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী এই ভার আনন্দে গ্রহন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, বোমা বন্দুক ছাড়া এ কাজ তিনি করিয়া দিবেন; সকলেই ভাবিতেছে না জানি কি প্ল্যান তাঁর মস্তিষ্কের হাত-বাক্সে সঞ্চিত আছে।

প্রধান মন্ত্রী একজন বড় ফুটবল খেলোয়াড়—তাঁর দল ইতিহাস প্রসিদ্ধ; সারা বাঙলা জয় করিয়া ফিরিয়াছে, কোথাও হারিতে হয় নাই; কাজেই তিনি ফুটবল খেলাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া মনে করেন; তিনি বলিলেন এই ফুটবল খেলার দ্বারাই জার্ম্মাণ-রাশিয়ার সমস্যা মিটাইয়া দিবেন। যুদ্ধেও হার জিত আছে, উপরন্তু খরচা রক্তপাত ফুটবল খেলায়ও হারজিত আছে, এক সোডা লেমেনেডের খরচা ছাড়া অন্য খরচ নাই।

রক্তপাত করিলে কিম্বা ফাউল করিলে মাঠ হইতে খেলয়াড়কে বাহির করিয়া দিবেন। উভয় পক্ষই ফুটবলের মধ্যস্থতা মানিয়া লইতে রাজি হইয়াছে।

যথা সময়ে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার দল খেলার মাঠে গিয়া দাঁড়াইল, একদলের কাস্তে, হাতুড়ি আঁকা লাল জার্সি; অন্য দলের স্বস্তিক আঁকা একটা জার্সি; একদলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ষ্ট্যালিন, অন্য দলের হিটলার; একদিকে লাইন্সম্যান চিয়াং কাইশেক, অন্য দিকে মুসোলিনী; একদিকে গোলজাজ রুজভেল্ট অন্যদিকে চেম্বারলেন; আর বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং রেফারী। তিনি কব্জির ঘড়ি দেখিয়া হুইসিল বাজাইয়া দিলেন; জগতের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম পলিটিকাল ফুটবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তোমরা ভাবিতেছ নেশার ঝোঁকে কমলাকান্ত মাথামুণ্ড কত কি বকিয়া যাইতেছে—সব মিথ্যা, সব কল্পনা! আমি তর্ক করিব না, তোমাদের কথাই মানিয়া লইলাম, সবই কল্পনা, নেশাখোরের প্রলাপ! ইউরোপ আজিও যুদ্ধ ছাড়ে নাই; বাঙলাদেশের মধ্যস্থতা আজিও কেহ স্বীকার করে না, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফুটবল খেলোয়াড় নহেন—সবই স্বীকার করিতেছি।

কিন্তু নেশাখোরের একটা কথা শুনিবে কি? সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে কি? আমি বলিতেছি ইউরোপের যুদ্ধোদ্যম থামানো অসম্ভব নয়, এবং তাহা তোমরাই পার, তোমরা ডাল-ভাতখোর, কবিতা-লেখক,

কলম-পেষক বাঙালী—যে জাতির মধ্যে কমলাকান্তরূপ পদ্ম ফুটিয়াছে! তোমরা হাসিতেছ বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ভাবিতেছ, এ নূতন আর একটা প্রলাপ! কিন্তু এ প্রলাপ নয়।

ইউরোপের শক্তিকে যদি অন্য কোন পথে পরিচালিত করতে পার, যদি তাহা কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকে তবে যুদ্ধের স্পৃহা তাহাদের মধ্যে স্বভাবতই কমিয়া আসিবে; তোমরাও নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে ও জাগিয়া জাগিয়া কমলাকান্তের মত নেশা করিতে পারিবে।

তোমরা ভাবিতেছ কি সেই উপায়? তবে বলি শোন। প্রতিবৎসর বাঙলাদেশ হইতে শত শত ছাত্র পড়িবার জন্য ইউরোপের নানাদেশে যায়। একটু চেষ্টা করিলেই তাদের দিয়াই এ-কাজ সম্ভব হয়। না ভয় নাই, বোমা, বন্দুক, প্রোপাগাণ্ডা ও-সব কিছুই নয়, কারণ ওসব ভারতীয় পন্থা নয়; ওসবে ইউরোপের সঙ্গে পারিবে না।

প্রত্যেক বাঙালী ছাত্র ইউরোপের যাইবার সময় কিছু করিয়া কচুরী পানার শুকনো শিকড় লইয়া যাইবে, আর ইউরোপে গিয়া নদী নালা বিল খাল ও হ্রদে তাহা ছাড়িয়া দিবে,—এইসব কচুরী পানার শিকড় জল পাইয়া গাছ হইয়া গজাইবে; দু-চার বছর এই রকম করিলেই দেখিবে ইউরোপের নদী নালা বিল খাল ও হ্রদ, সমস্ত জলপথ কচুরী পানায় ঠাসিয়া ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে! সে কচুরী পানার ব্যূহ ভেদ করিয়া নৌকা তো দূরের কথা, যুদ্ধ জাহাজও চলিতে পারিতেছে না!

তখন কি হইবে বলিতে পার? তোমাদের কল্পনা শক্তি নাই কি করিয়া বলিবে, আমি বলি মন দিয়া শোন। দেশের জলপথ পরিষ্কার করিবার জন্য মুসোলিনী তার কালো সার্ট লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে;

হিটলার তাঁর কটা সার্ট লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ; ষ্ট্যালিনের বিশ লক্ষ সৈন্য বিশ লক্ষ বেয়নেট ফেলিয়া লাগিয়াছে ; জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট পরস্পরকে আক্রমণ ছাড়িয়া যুগপৎ কচুরী পানাকে আক্রমণ করিতেছে ; ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট করিয়া কচুরীর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে।

ওদিকে কচুরী পানায় রাইন নদী সবুজ ; জার্ম্মাণীর কিলক্যানেল কচুরী পানায় ভর্ত্তি, যুদ্ধের জাহাজও বন্ধ ! সুয়েজ খালে ঠাসা কচুরি ; প্রাচ্যে আবার আফ্রিকা ঘুরিয়া আসিতে হইবে, কিন্তু আসিবে কে ? সব যে কচুরী পানার বিরুদ্ধে ক্রুজেডে নিযুক্ত ! বাস্, এই সুবর্ণ সুযোগে (কিম্বা উদ্ভিজ্জ সুযোগ বলিলেও হয়) তোমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দাও—ইউরোপের সাধ্যও নাই তোমাদের ঠেকাইয়া রাখে !

কচুরী পানার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে ইউরোপের লোকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, ক্রমে অস্ত্র-শস্ত্রে, কামান-বন্দুকে, এরোপ্লেন-জাহাজে, মরিচা ধরিবে ; অবশেষে তারা যুদ্ধ করা ভুলিয়া যাইবে।

ধীরে ধীরে কচুরী পানার প্রভাবে ইউরোপে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইবে, অজন্মা হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে—অনাহারে ইউরোপের লোক আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিবে—পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপিত হইবে।

হয় তো দেখিবে এমন দিন আসিবে যখন শত্রুদের দেশে এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ না করিয়া কচুরী পানার শিকড় বর্ষণ করা হইবে—নদীনালায় বিলখালে ! এ বোমা এমন অহিংস, এমন উদ্ভিজ্জ যে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও ইহাতে আপত্তিকর কিছু খুজিয়া পাইবেন না ! সে দিন কি তোমরা কমলাকান্তর কথা মনে রাখিবে ? কোন অজ্ঞাতকুলশীল

ব্যক্তিকে এই ভেজিটেব্‌ল বোম আবিষ্কারের কৃতিত্ব দান করিবে। জগতে এই রকমই হয়।

কি! কথাগুলি বিশ্বাস হইল না। তা' হইবে কেন? আমার যে বৈদেশিক ডিগ্রি নাই, আমার যে টাকাকড়ি নাই, আমার যে মুরুব্বি নাই! কি ইহাকে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিলে? প্রতিভাবানের প্রলাপ হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে! আজিকার স্বপ্ন আগামীকল্যকার বাস্তব! কী? ···এত বড় আস্পর্দ্ধা —বলিতেছি যে কমলাকান্ত নেশা করিলে কখনই এমন অদ্ভুত কথা কখনই বলিতে পারিত না। যে বলে যে কমলাকান্ত নেশাখোর নয়, সে অধঃপাতে যাউক। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বাঙালী মানুষ না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ক্রণিক নেশাখোর।

রোহিণীর কি হইল ?

রোহিণীর মরে নাই ; পিস্তলের আওয়াজে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। গোবিন্দলাল চলিয়া গেলে, কিছুক্ষণ পরে রোহিণী মূর্চ্ছা ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল. দেখিল গোবিন্দলাল নাই। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল ও যেদিক হইতে রাসবিহারী আসিয়াছিল, সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ চলিয়াও রাসবিহারীর দেখা পাইল না, তবু সে ফিরিল না ; কারণ গোবিন্দলালের গৃহে যাইবার পথ বন্ধ।

রোহিণী চলিতে চলিতে রাসবিহারীর দেখা পাইল না, তবে রাসবিহারী এভিনিউয়ে আসিয়া পড়িল। সারা রাত্রি চলিয়াছে, সারা দিন চলিয়াছে, তাহার আর পা চলে না—সে পথের পাশে এক জায়গায় বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ সে এভাবে বসিয়াছিল জানে না হঠাৎ পিঠের উপরে কাহার স্পর্শ পাইয়া চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। মুখ ফিরাইতেই দেখিল একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি ; রোহিণী তাহাকে সম্বোধন করিয়া নিজের কাহিনী বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভদ্রলোক তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—মহীয়সী নারী ! আমি সব জানি। আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। তোমার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে আমি তোমারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। আসিয়াছ ভালই করিয়াছ।

রোহিণী দেখিল জগতে এখনো ভাল লোক আছে। একদিন

গোবিন্দলালকে তাহার ভাল মনে হইয়াছিল কিন্তু এ ভাল, সে ভাল নয় ; এ যে বয়স্ক ভাল। তাই সে বলিল—প্রভু—

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—নারী ! আমি প্রভু নই, আমি দরদী, আমাকে শ্রীকান্ত বলিয়া ডাকিও—শ্রীকান্ত দা ও বলিতে পার।

রোহিণী গোবিন্দলাল-বিমোহিনী স্বরে [ব্যাকরণে ভুল হইল—তা হোক—বড় মিষ্ট শুনাইতেছে] ডাকিল—শ্রীকান্ত-দা—

শ্রীকান্তের মরিচা-পড়া হৃদয়-বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—অনেকদিন এভাবে কেহ তাহাকে ডাকে নাই।

রোহিণী বলিল—শ্রীকান্ত-দা যখন সবই জানো, কি আর বলিব। আমার এ জন্ম ব্যর্থ হইয়া গেল—আমার নারীত্ব, আমার যৌবন যেন শিকায়-তোলা আচার, আহার শেষ হইয়া গেলে মনে পড়িল। এ ছাই লইয়া আর কি করিব !

শ্রীকান্ত বলিল—এ কি কথা বলিতেছ রোহিণী ! হতভাগ্য গোবিন্দলাল তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি জগতে আর লোক নাই। তুমি কি জানো তোমারি মধ্যে কত সম্ভাবনা হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ভিক্‌টোরিয়ান যুগের লেখক বঙ্কিম তাহা বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু এ হইতেছে আন্তর্জ্জাতিক যুগ ; যে-সব ধুরন্ধর লেখকগণ এ যুগে বর্ত্তমান, তাহারা কেহই তোমাকে অমনি ছাড়িয়া দিবে না !

রোহিণী তাহার পদপ্রান্তে নত হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—আমাকে লইয়া যাহা হয় কর।

শ্রীকান্ত বলিল—শোনো রোহিণী ! প্রথমে তোমার মধ্যের মুকুলিত নারীত্বকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে ; তখন সেই পূর্ণ বিকশিত নারীত্বের মকরন্দে দিগ্‌দিগন্ত হইতে ভ্রমর আসিয়া জুটিবে। ভাবিয়া দেখ সে কি আনন্দের দিন—তোমার এবং বাংলাদেশ উভয়েরই পক্ষে ! বলিতে বলিতে শ্রীকান্তের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে কি করিতে হইবে ?

শ্রীকান্ত—প্রথমে তোমাকে ওই বঙ্কিমী নামটা ত্যাগ করিতে হইবে। এমন একটা নাম গ্রহণ কর, যাহার বলে অনায়াসে তুমি হিন্দুজাতির দুর্ভেদ্য সতীত্বের কেল্লায় প্রবেশ করিতে পার। মূঢ় হিন্দুরা পৌরাণিক যুগ হইতে যে নামটাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে, যাহার মধ্যে সতীত্বের আদর্শ ঘনীভূত, সেই নামটা তুমি গ্রহণ কর। দেখিবে নামীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ব্যক্তিত্বও বদ্‌লাইয়া যাইবে। আজ হইতে তুমি রোহিণী নও—তুমি সাবিত্রী !

রোহিণী বলিল—আমি সাবিত্রী ! কিন্তু এখন কি করিব।

শ্রীকান্ত—এবার তুমি গিয়া এক মেসের ঝি হইয়া থাকো।

মেসের ঝি ! সাবিত্রী আবার বসিয়া পড়িল।

শ্রীকান্ত—সাবিত্রী। স্বর্গের সিঁড়ির নিম্নতম কয়েকটা ধাপ বড়ই নোংরা ; সামাজিক স্বর্গের নিম্নতম ধাপ ওই মেস্। একবার যদি তোমাকে মেসে ঢুকাইয়া দিতে পারি তবে আশা আছে একদিন সম্ভ্রান্ততম ঘরের গৃহিণী করিয়া বাহির করিতে পারিব। বিশেষ, মেসের মস্ত একটা সুবিধা, সেখানে একাধিক গোবিন্দলাল বিরাজমান, তারা তোমার ওই গোঁয়ার গোবিন্দলালের মত কথায় কথায় পিস্তল বাহির করিয়া বসে না।

মুকুলের বিকাশের পক্ষে যেমন ভ্রমর, নারীত্বের বিকাশের পক্ষে তেমনি মেসের অধিবাসিগণ!

(হায়, সে মেসের সত্যযুগ গিয়াছে—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।)

*　　　*　　　*　　　*

শ্রীকান্ত ও সাবিত্রী যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিল তখন সাবিত্রী মাঝে মাঝে শ্রীকান্তের দিকে তাকাইয়া চোখ মারিতেছিল। অসদুদ্দেশ্যে নয়—রোহিণীর ও একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীকান্ত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—নারী আমাকে পারিবে না; আমি অভয়া, কমললতা, রাজলক্ষ্মীর মত ধারালো ক্ষুরের উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়াছি, তবু পা কাটে নাই। কিন্তু মেসে গেলে আর ঝি-রূপে কিছুদিন থাকিলে দেখিবে তোমার বঙ্কিমচন্দ্র-অবহেলিত নারীত্ব অকস্মাৎ তুবড়ি বাজির মত উৎসারিত হইয়া উঠিবে। ভাবিয়া দেখনা কেন দ্রৌপদীও তো একবছর ছদ্মবেশে বিরাট-রাণীর দাসিত্ব করিয়াছিল!

অনেক বলিবার পর সাবিত্রী মেসে ঝি-রূপে যাইতে রাজি হইল। শ্রীকান্ত নিজের পরিচিত একটি মেসে তাহাকে চাকুরি ঠিক করিয়া দিল।

২
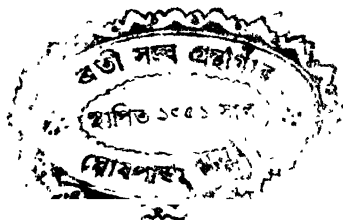
এই ঘটনার ছয়মাস পরে একদিন শীতের সকাল বেলা রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া শ্রীকান্ত খেজুরের রস পান করিতেছিল এমন সময়ে সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। শ্রীকান্ত অনেকদিন তাহাকে দেখে নাই, হঠাৎ তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি সাবিত্রী, ব্যাপার কি?

সাবিত্রী বলিল—শ্রীকান্ত-দা, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শ্রীকান্ত—সেজন্য তো তোমাকে প্রস্তুত থাকিতেই বলিয়াছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে এখনো উহাকে তুমি সর্ব্বনাশ বল! নারীত্বের বিকাশের পক্ষে উহা অত্যাবশ্যক।

সাবিত্রী বলিল—আপনি আসল কথা বুঝিতে পারেন নাই; আগে সব শুনুন, পরে যাহা হয় বলিবেন! এই বলিয়া সাবিত্রী তাহার মেসের ঝি-জীবনের কাহিনী আরম্ভ করিল!

মেসের মেম্বরগণ সকলেই ভদ্র, আমাকে অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করিত; অনেক সময় আমি ভুলিয়া যাইতাম যে আমি ঝি আর তারা আমার মালিক!

প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে দেখিতাম আমার ঘরে কে যেন সন্দেশ রাখিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা দেখিতাম সুগন্ধি তৈলের শিশি আমার ঘরে; দুপুরবেলা দেখিতাম ভাল শাড়ি কাপড় বিছানার উপরে রাখিয়া দিয়াছে; রাত্রিবেলা বালিশের তলে টাকা কড়ি পাইতাম! প্রথমে

কাহাকেও ধরিতে পারি নাই কে এমন চুরি করিয়া উপহার রাখিয়া যাইত! ক্রমে প্রকাশ পাইল, সতীশ বলিয়া একটি বাবু এসব কাণ্ড করিতেছেন। সতীশবাবুর বয়স অল্প, সুপুরুষ, বড়লোকের ছেলে, মনটি ভারি নরম।

একদিন অমাবস্যার রাত্রিতে শুইয়া আছি—মাঝ রাত্রে আমার খাটের তলা হইতে সতীশবাবু বাহির হইয়া প্রেম নিবেদন করিলেন। (এইখানে শ্রীকান্ত চোখ বুজিয়া রসের গেলাসে চুমুক দিল) আমি আপনার সেই মন্ত্র ভুলি নাই, বলিলাম, সতীশবাবু মহৎ প্রেমের প্রাণ ব্যর্থতায়। আমাকে পাইলেই দেখিবেন পাওয়া হইল না, কাজেই আপনি ও পণ ত্যাগ করুন। কিন্তু শ্রীকান্ত-দা সতীশবাবু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তিনি রোগের চিকিৎসা করেন না—লক্ষণের চিকিৎসা করেন। তিনি বলিলেন, সাবি! (মাইরি শ্রীকান্ত-দা, তার মুখে এই অর্দ্ধনামটি বেশ মিষ্টি শোনায়।) তোমার লক্ষণ যে প্রেমের। সে রাত্রিতে তিনি চলিয়া গেলেন। আবার পরের অমাবস্যায় হাজির। আমি জিজ্ঞাসা, করিলাম, এতদিন পরে যে! তিনি বলিলেন, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আমি, ঘন ঘন ঔষধ দেওয়া আমাদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

কিন্তু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হইলেও এখন তিনি ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করিলেন! মেসের মধ্যে কলঙ্ক রটিল। তাঁহাকে বলিলাম—কলঙ্ক রটিতেছে যে। তিনি উত্তর দিলেন—কলঙ্ক না থাকিলে প্রেমে সুখ কোথায়?

কিন্তু সতীশবাবু একা নন; আরো অনেক মেম্বার লুকাইয়া টাকাকড়ি শাড়ীগহনা দিতে আরম্ভ করিল; তাদের প্রেম ও উপহার দুই পরিত্যাগ করা উচিত নয় ভাবিয়া উপহারগুলি লইতে লাগিলাম। টাকায় শাড়ীতে

অলঙ্কারে একবাক্স ভরিয়া গেল। বড়লোকের ছেলে গোবিন্দলাল অনেক দিয়াছিল, বটে, আসিবার সময় আনিতে পারি নাই।

সতিশবাবু বলিতেন—চল সাবি! অন্যত্র যাওয়া যাক্। আমি বলিতাম, সতীশবাবু এই মেসেই আমার সাধনার স্থান—এই আমার স্বর্গের সিঁড়ি। কাল রাত্রে সতীশবাবু অনেকক্ষণ ঘরে ছিলেন—আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম—ভোরবেলা জাগিয়া দেখি আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শ্রীকান্ত বলিল—কুসংস্কার সাবিত্রী, কুসংস্কার। পৌরাণিক সাবিত্রী যে কুসংস্কারের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছে, আধুনিক সাবিত্রীর তাহার মুলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

সাবিত্রী—আপনি কি বলিতেছেন?

শ্রীকান্ত—তোমার নারীত্ব অপহৃত হইয়াছে? সাবিত্রী এত দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া বলিল—শ্রীকান্ত-দা নারীত্ব আর বিদ্যা একজাতীয়—যতই করিবে দান তত যায় বেড়ে। আমি ওকথা বলিতেছি না।

শ্রীকান্ত—তবে তোমার কি অপহৃত হইল?

সাবিত্রী—এতদিনের সঞ্চিত টাকা কড়ি, গহনাপত্র।

শ্রীকান্ত—চোর কে?

সাবিত্রী—আমার মন-চোর সেই সতীশবাবু। তাঁহাকেও সকালবেলা হইতে পাওয়া যাইতেছে না।—ইহার চেয়ে গোবিন্দলাল অনেক ভাল ছিল।

ততক্ষণে শ্রীকান্ত সবটুকু খেজুর রস শেষ করিয়াছে! সে বলিল—কোন ভয় নেই সাবিত্রী ইহার নাম বাংলা দেশ—হৃদয়রাজ্যের চৌমাথার

মোড়ে ইহার অবস্থান। একটি পথ না হইলে অপর পথ আছে। তোমাকে আমি সিনেমায় ঢুকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। দেখিবে যে সে পথ মেসের পথের চাইতে অনেক সরস, সহজ ও সার্থক, মানে অর্থময়।

শ্রীকান্তের চেষ্টায় সাবিত্রী সিনেমায় অভিনেত্রী রূপে প্রবেশ করিল।

৩

তারপর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে সাবিত্রীর চাক্ষুস দেখা হয় নাই, কিন্তু দেওয়ালে প্রাচীরে যত্র তত্র সাবিত্রীর ছায়ামূর্ত্তি বিজ্ঞাপিত। শ্রীকান্ত তাহার সাজসজ্জা, কিম্বা সত্য কথা বলিতে গেলে সাজসজ্জার অভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, সাবিত্রীর অন্তরের (এবং দেহের) সুপ্ত নারী প্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

সেদিন শ্রীকান্তের মনটা ভারি খারাপ—সে একা বসিয়া বসিয়া স্পেন্সারের Date of Ethics-এর মধ্যে হরিদাসের গুপ্তকথা রাখিয়া পড়িতেছিল—এমন সময়ে সাবিত্রী আসিয়া উপস্থিত। শ্রীকান্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিল—একি সাবিত্রী! তোমার এই চেহারা; যেন কুড়ি বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে।—ব্যাপার কি?

সাবিত্রী বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল—অনেক কষ্টে বলিল—শরীরে আর কিছু নাই শ্রীকান্ত-দা! নারীত্ব বিকাশের সাধনায় মনুষ্যত্ব

পর্য্যন্ত গেল। এ কোথায় পাঠাইয়াছিলে? মেস্ যদি স্বর্গের সিঁড়ি হয়, সিনেমা কি তবে নরকের খিড়কি দরজা!

শ্রীকান্ত—কি হইয়াছে?

সাবিত্রী—বলিলে বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু না বলিয়াই বা কি করি? কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছ?—বাত, গেঁটে বাত!

শ্রীকান্ত হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিয়া চলিল—নাচিতে নাচিতে পায়ের জয়েণ্টগুলাতে গেঁটে বাত ধরিয়াছে; সিনেমার ম্যানেজার ও প্রয়োজকগণ না খাইতে দিয়া মেদ শুকাইবার ছলে হাড়শুদ্ধ শুকাইয়া ফেলিয়াছে—বোধহয় যক্ষ্মায় ধরিয়াছে।

শ্রীকান্ত—টাকা কড়ি পাইয়াছ তো?

সাবিত্রী—খাতায় পত্রে পাইয়াছি, এক পয়সাও আদায় করিতে পারি নাই। ইহার চেয়ে যে সতীশরাবুও ভাল ছিলেন? এখন কি করি।

শ্রীকান্ত বলিল—তাইতো তোমার রূপ ও যৌবন দুই-ই গিয়াছে। নারীত্ব বিকাশের ব্যবসায়ে ওই দুইটিই প্রধান মূলধন! এখন তুমি একেবারে দেউলে।

সাবিত্রী—সেই জন্যেই সিনেমা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আমার গতি কি।

শ্রীকান্ত ভাবিতেছিল, এই কি সেই রূপ, যাহা বারুণী পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের তরল আয়নায় নিমজ্জমান দেখিয়া গোবিন্দলালের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল? এই কি সেই রূপ, যাহার তুলনায় হতভাগিনী ভ্রমর উপেক্ষিত হইয়াছিল? এই কি সেই রূপ, যাহা দেখিয়া অভয়া-কমললতা-রাজলক্ষ্মী

অবজ্ঞাকারী শ্রীকান্তের বৈরাগ্য-কন্‌ক্রিট মনও ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল ?

সাবিত্রী বলিল—বলুন শ্রীকান্ত-দা এবার আমি কি করি ?

শ্রীকান্ত বলিল—সাবিত্রী ! এক পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া তোমার জীবনের অভিযান সুরু হইয়াছিল আর পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া তাহা শেষ কর। ওই দেখ 'লেক'। এই বলিয়া শীর্ণ আঙুল দিয়া ঢাকুরিয়া লেক দেখাইয়া দিল।

সাবিত্রী ক্ষণকাল আত্ম-সংবরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের দোষ কোথায় ? তিনি আমার জন্য পিস্তলের গুলির ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর তুমি করিতেছ লেকের ব্যবস্থা ! পিস্তলের গুলি রাগের মাথায় লোকে ছোঁড়ে, আর তুমি দিব্য ঠাণ্ডা মেজাজে লেকের জল দেখাইয়া দিতেছ ; আমার বঙ্কিমচন্দ্রই ভাল। শুনিয়াছিলাম বাংলাদেশ বঙ্কিমের পরে অনেক অগ্রসর হইয়াছে ; কিন্তু কোন দিকে ?—লেকের দিকে ?—বহুপূর্ব্ব বিবেচিত স্বার্থপরতার দিকে ?—স্বর্গের সোপানে দুই ধাপ উপরে তুলিয়া গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে পতনের দিকে ? ইহার চেয়ে যে বঙ্কিমচন্দ্রই ভাল। আমি তোমার ঘর ছাড়িলাম কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়িবনা। বাংলা দেশের সিংহদ্বারের এক প্রান্তে বসিয়া থাকিব—আমাকে ঘরে তুলিতে পারিবে না, কিন্তু যাতায়াতের পথে আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। আর যখন মরিব, আমার সমস্যাকে রাখিয়া যাইব ! সে ভূতের মত তোমাদের আশা-আনন্দ আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ কালো ছায়াপাত করিবে—মাঝে মাঝে তোমরা শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিবে—দেখিয়া আমি পরলোকে

হাসিতে থাকিব। আমার প্রতিনিধির মত এই সমস্যা থাকিবে—শ্রীকান্তের ভরসায় নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পুনরভ্যুত্থানের ভরসায়। যতদিন তাঁর আবির্ভাব না হয় আমি বাংলাদেশের সিংদ্বারের প্রান্তে প্রহর গুণিয়া বসিয়া থাকিব।—এই বলিয়া দৃপ্ত সাবিত্রী প্রস্থান করিল। শ্রীকান্ত ডাক দিল—এই রতন তামাক দিয়ে যা।